শ্রমিক ইস্তাহার

৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | এপ্রিল-মে ২০০৮ | শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র | দাম: ১.৫০ টাকা

মে দিবস ২০০৮

নতুন সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান নিয়ে আসছে

মে দিবস, ২০০৮। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন তথা দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণী তাদের সমস্ত নখ-দাঁত নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই হামলা তীব্র হতে শুরু করেছে এবং যত দিন যাচ্ছে এর তীব্রতার মাত্রা বেড়েই চলেছে। একের পর এক শ্রমিকদের চালু পুরোনো সব সুযোগসুবিধা হাতছাড়া হয়ে চলেছে। ভি আর এস দিয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কারখানা থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় সরকারি কারখানাগুলোতে ৩ বছর থেকে ৫ বছর অন্তর হওয়া বেতন-চুক্তিকে বাড়িয়ে ১০ বছর অন্তর করার চক্রান্ত চলছে। অন্যদিকে, ভারি-মাঝারি শিল্পেও ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদের মাইনে খুব কম। নামমাত্র মজুরিতে খাটতে হচ্ছে হাড়ভাঙা খাটুনি। ডিউটি দিনে ১২ ঘণ্টা, কোথাও আরও বেশি। নেই ডি এ, বহু কারখানায় শ্রমিকরা এমনকি ই এস আই/পি এফের সুবিধে থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। "সেজ"-অঞ্চলে যে সমস্ত নতুন কারখানা হচ্ছে, সেখানে শ্রমিকদের কার্যত কোনও অধিকারই নেই। কেন্দ্রে ও রাজ্যে সমস্ত ধরনের পার্টির সরকারগুলো মালিকদের এই অবাধ আক্রমণকে মদত করছে। এমনকি, পশ্চিমবঙ্গ-কেরল-ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যের বাম সরকারগুলোরও চেহারা একই রকম। মুখে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লম্বা-চওড়া ভাষণ, কিন্তু বাস্তবে এইসব রাজ্যে এই নীতিকেই লাগু করে চলেছে। চটকলগুলোর মালিকরা এদেরই মদতে উৎপাদনের সাথে বেতনের একাংশকে জুড়ে দিয়ে কাটৌতি চালু করে শ্রমিকদের বেতন কেটে নিচ্ছে, উৎপাদনের বোঝা চাপাচ্ছে, স্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা কমছে, ঠিকা-ক্যাজুয়াল-জিরো মার্কা শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে, আর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ডি এ বাড়ছে না।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের হামলা খালি শ্রমিকদের ওপরেই নামছে না, গ্রামেও নামছে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পায়নের নামে বড় বড় দেশী-বিদেশী মালিকদের স্বার্থে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, চুক্তিবদ্ধ চাষের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বাঁধনে কৃষকদের বেঁধে ফেলা হচ্ছে। বীজ-সার-কীটনাশক ওষুধ-সেচের জলের দাম বাড়ার ফলে চাষের খরচও বেড়ে যাচ্ছে। ঋণের ফাঁদে পড়ে কৃষক হচ্ছে সর্বস্বান্ত আর দেশী-বিদেশী, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণ বেড়েই চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বিদেশ থেকে সরকার বেশি দাম দিয়ে খাদ্যশস্য আমদানি করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বিশেষ করে চাল, আটা, তেল, ডালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রোজগার কম, তবু ধার-দেনা করে পেটের খিদে মেটানোর জন্য খাবার কিনতে বাধ্য হচ্ছে গরিব চাষী-ক্ষেতমজুর সহ অন্যান্য খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়ছে না, অথচ আগুন হয়ে উঠেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম।

এই যখন হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের অবস্থা, তখন পুরোনো পার্টি ও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি বিশ্বায়নের হামলার সামনে শ্রমিকদের আত্মসমর্পণের পথ দেখাচ্ছে। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে গদ্দারি করছে। কালাচুক্তিতে সই করে শ্রমিকদের ওপর মালিকদের আক্রমণ নামাতে সাহায্য করছে। এরাই চটকলগুলিতে কাটৌতির কালাচুক্তি করছে।

মালিকশ্রেণীর হামলার সামনে শ্রমিকদের আত্মসমর্পণ, নেতাদের গদ্দারি এটাই সব নয়। মে দিবস ২০০৮এ আরেকটি ছবিও দিন-কে-দিন স্পষ্ট হচ্ছে। মার খেতে খেতে শ্রমিকরা বুঝতে পারছে পুরোনো পার্টি ও সংগঠনগুলির নগ্ন মালিকঘেঁষা চেহারা। তারা ফেটে পড়তে শুরু করছে এদের বিরুদ্ধে, এদের নেতাদের বিরুদ্ধে। ভিক্টোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকরা পুরোনো দালাল নেতাদের চরম ধোলাই দিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, পরে বিভিন্ন জুট মিলে এই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ছত্রভঙ্গ পিছু হটা শ্রমিকশ্রেণী কারখানায় কারখানায় মালিকশ্রেণীর নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিশ্বায়নের পর থেকে একতরফা মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিকশ্রেণী দেশে দেশে পরাজয়ের ধাক্কাকে সামলে উঠে আবার লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছে। পুরোনো সংগঠনগুলি, যেমন সিটু-আইটাক-ইনটাক মার্কা সংগঠনগুলির ওপর তাদের রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করার পাশাপাশি নিজেরা আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এখনই ব্যাপক আকারে না হলেও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে এই প্রক্রিয়া ক্রমশ বাড়তে দেখা যাচ্ছে। যেখানেই লড়াই হচ্ছে, সেখানেই শ্রমিকদের নতুন সংগ্রামী নেতাদের লড়াইয়ের সামনে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে, গড়ে উঠছে সংগ্রামের নতুন সংগঠনও। বাহাদুর সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিকদের নতুন স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সিটুর মতো পুরোনো সংগঠনগুলো এই নতুন শ্রমিকনেতাদের হত্যা করেও শ্রমিকদের দমাতে পারছে না।

নতুন নেতা, নতুন সংগঠন চাই — খালি আমাদের দেশেই নয়, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নগ্ন হামলা দেশে দেশে লড়াকু আগুয়ান শ্রমিকদের কাছে এই বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে। জার্মানি-ফ্রান্স-ব্রিটেন-আমেরিকা সর্বত্রই শ্রমিকদের নতুন লড়াই নতুন সংগঠন একটু একটু করে হলেও মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। বেসরকারিকরণ ও ছাঁটাইএর চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের Postal কর্মচারীদের সংগ্রামে পুরোনো নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ও নতুন সংগ্রাম-সংগঠনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে।

আগুয়ান শ্রমিকভাইসব! আপনাদের এই অভিজ্ঞতাও হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন তথা দেশী-বিদেশী মালিকদের নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে কারখানায় কারখানায় নতুন সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ কত কঠিন হয়ে পড়ছে। হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং (তিলজলা প্ল্যান্ট)-হিন্দমোটর-জুট মিলগুলোতে এই অভিজ্ঞতা আপনাদের হচ্ছে। এক একটা কারখানায় আলাদা আলাদা করে ট্রেড ইউনিয়নের লড়াইয়ের গণ্ডির ভেতরে থেকে মালিকদের হামলা (যা মালিকশ্রেণীদের একটাই সাধারণ ঐক্যবদ্ধ নীতির ভিত্তিতে আলাদা আলাদাভাবে এক-একটা কারখানায় নামছে) মোকাবিলা করা যে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে, তাও আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারছেন। এই অবস্থায় কারখানা স্তরে প্রতিরোধকে যেমন জোরের সাথেই করতে হবে, সাথে সাথে দেশজোড়াও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও সংগঠন কীভাবে গড়ে তোলা যায়, সেটাকেও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে — যাতে আলাদা আলাদা ভাবে কারখানাগুলোর লড়াইগুলোকে ওরা পিষে মারার সুযোগ না পায়।

আগুয়ান শ্রমিকভাইসব! আপনারা সমাজের সবচেয়ে আগুয়ান বাহিনী। মে দিবস ২০০৮এ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বায়নের হামলা আপনাদের যেমন ক্ষতবিক্ষত করছে, তেমনই গ্রামের গরিব মানুষদেরকেও রেয়াত করছে না। এবং এর বিরুদ্ধে গ্রামেও বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ক্রমশ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এই লড়াইগুলোর দিকেও আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে নজর করতে হবে। দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এরাও যাতে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে পারে, পুরোনো পার্টিগুলোর চিন্তাভাবনা থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে, সে ব্যাপারেও আপনাদেরকেই নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা নেওয়ার কথা ভাবতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিক-কৃষকদের প্রকৃত বিপ্লবী জোট। মে দিবস ২০০৮ এই আহ্বানই আগুয়ান শ্রমিকদের কাছে নিয়ে আসছে। ■

মিঠু ঘোষ তো জামিন পেল, কিন্তু . . . ?

গত ১৪ই মে শেষ পর্যন্ত জামিন পেল শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির সংগঠক কমরেড মিঠু ঘোষ। গত ফেব্রুয়ারি মাসে "মাওবাদী" ছাপ্পা মেরে নন্দীগ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুরু থেকেই এটা পরিষ্কার ছিল যে মিঠু ঘোষ মাওবাদী নয়। তা সত্ত্বেও নন্দীগ্রামের পুলিশ মিঠু ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল, কারণ "নন্দীগ্রামে যা কিছু ঘটছে, তার জন্য মাওবাদীরা দায়ী" — সিপিএম-এর এই প্রচারকেই ওদের সত্যি প্রমাণ করা দরকার ছিল।

গ্রেফতারের পর দায়ের করা এফ আই আর-এ একটা আশ্চর্যের বিষয় দেখা গেল। গ্রেফতারের সময় তৈরি Seizure List-এ এক দিন পরে পুলিশ খুদে খুদে অক্ষরে সি পি আই (মাওবাদী)দের কিছু কাগজের নাম জুড়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এফ আই আর-এ শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ মোট ১২ জনের নাম একতরফা ঢুকিয়ে তাদের নামেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ জুড়ে দেওয়া হয়। আরও আশ্চর্যের, এর বিরুদ্ধে এমনকি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত মিঠু ঘোষের জামিন দিল না। শেষ পর্যন্ত, গ্রেফতারের পর তিন মাস পূরণ হলে গত ১৪ই মে হলদিয়া কোর্ট মিঠু ঘোষকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে।

নন্দীগ্রাম থেকে মিঠু ঘোষের গ্রেফতার ও তার পরবর্তী পর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরও একবার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে সামনে উঠে এল।

গত কয়েক বছরে একটা ভয়ংকর দমবন্ধ করা হামলা চেপে বসেছে শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষের ঘাড়ে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতিকে হাতিয়ার করে দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণীরা অতিমুনাফার লোভে সম্পূর্ণ বেপরোয়া পাগল হয়ে উঠেছে। স্থায়ী চাকরি — এখন ইতিহাস। ঠিকা-ক্যাজুয়াল-টেম্পোরারি-বদলি — এটাই এখন স্বাভাবিক! দীর্ঘ রক্তাক্ত লড়াই করে অর্জন করা আট ঘণ্টা কাজের সময় — হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। ESI-PF-Pension-Gratuity-DA-Increment-Canteen-Leave — পুরোনো সব অধিকারই এখন প্রায় বাতিল। দেশের বেশির ভাগ শ্রমিকের দৈনিক রোজ এখন ৬০-৮০ টাকা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য গরিব মানুষের হাতের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে। গ্রামে কাজ নেই — কাজের খোঁজে এক রাজ্য থেকে গ্রামের গরিব মানুষেরা পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে, সেখানে জুটছে মধ্যযুগীয় শোষণ। শিল্পায়ন-উন্নয়নের নাম করে ইচ্ছেমতো চলছে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া। বেড়েই চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। সমাজের ওপরতলার মাত্র ২০%-এর জন্য ভোগবিলাসের ঢালাও বন্দোবস্ত, অন্যদিকে গরিব মানুষের জন্য পড়ে থাকছে একটা অন্তহীন অন্ধকারের জগৎ।

এই পরিস্থিতিতে ডান-বাম সবকটা প্রতিষ্ঠিত পার্টিওয়ালাদের ভূমিকা কী ? তারা খুল্লমখুল্লা মালিকশ্রেণীদের এই নীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকারগুলোর মধ্যে দিয়ে গরিব মানুষদের ওপরে এই হামলাগুলো নামিয়ে আনতে উদ্যোগী ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে, গরিব মানুষ হয়ে পড়ছেন আরও বেশি অসহায়। এই অবস্থায় কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া গরিব মানুষ বাঁচার আর কোনও রাস্তা না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহে ফেটে পড়ছেন, স্বাধীনভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। হরিয়ানায় হোন্ডা, কর্নাটকে টয়োটা কির্লোস্কার, পশ্চিমবাংলায় সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিকদের বা জুট মিলগুলোতে লাগাতার স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ — জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-কলিঙ্গনগর-পস্‌কো-রায়গড় — পশ্চিমবাংলায় রেশন-ডিলারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ — এই ঘটনাকেই বাস্তবে ইঙ্গিত করছে। শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে এই বিদ্রোহ-প্রতিরোধগুলো শাসকশ্রেণীদের পার্টিগুলোর রাজনীতির টেনে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতে চাইছে না, নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ওপর ভরসা করে স্বাধীনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চাইছে। **ফলে, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতির ফিরিওয়ালারা এগুলোর মধ্যে একটা ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছে। স্বাধীনভাবে যেটুকু প্রতিরোধ ইতিমধ্যেই গড়ে উঠছে, তার থেকেই ওরা বুঝতে পারছে সামনের দিনে এই প্রতিরোধ আরও অনেক বড় চেহারা নিয়ে ফেটে পড়তে বাধ্য। ফলে, যেখানেই কোনওরকমের প্রতিরোধ দেখা যাচ্ছে, শুরু থেকেই তাকে পিষে গুঁড়িয়ে মারতে ওরা পুরো শক্তি কাজে লাগাচ্ছে। শুধু তাই নয়, একদম শুরু থেকেই যাতে সংগ্রাম ও সংগঠনের নতুন এই ধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, তার জন্য, বর্তমানের কার্যত অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকেও ওরা অন্যভাবে ঢেলে সাজাতে শুরু করেছে।**

গত কয়েক বছরে পুলিশের ভূমিকার কথাই খেয়াল করা যাক। কথায় কথায় থানায় ডেকে হুমকি দেওয়া, ছোটখাটো বিক্ষোভের ওপরেও বেপরোয়া লাঠি-গুলি চালিয়ে দেওয়া, তাও আবার সোজাসুজি মাথা বা বুক লক্ষ্য করে — আকছার-ই এ ঘটনা ঘটছে। কলিঙ্গনগর -পস্‌কো বা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে ভয়ংকর পুলিশী সন্ত্রাস ও গণহত্যার কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। কিন্তু, ২০০৫এ হোন্ডা শ্রমিকদের ওপর পুলিশের বীভৎস লাঠিপেটার ঘটনা; ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে ব্যাঙ্গালোরে টয়োটা-কির্লোস্কার কারখানায় ধর্মঘট করার অপরাধে ১৫০০ শ্রমিককে পুলিশের গ্রেফতার করে রাখার ঘটনা; ২০০৭এর ফেব্রুয়ারিতে কোয়েম্বাটুরে প্রাইসল কারখানায় ও দিল্লীর নয়ডাতে ইন্ডিয়া ইনটারন্যাশনাল কারখানার শ্রমিকদের লড়াইয়ের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনা; পশ্চিমবাংলায়,

বিশেষ করে হুগলির জুট মিলগুলোতে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ইত্যাদির কর্মসূচী নিলেই স্থানীয় থানা থেকে শ্রমিকদের তুলে নিয়ে যাওয়া ও নানারকম জুলুম-জেরা চালানো — এগুলো পুলিশের অনেক বেশি আগ্রাসী ভূমিকাকেই তুলে ধরছে। এবং এটা শুধু শ্রমিক বা কৃষকদের লড়াইয়ের ওপরেই নয়, সমাজের অন্যান্য গরিব নিপীড়িত মানুষদের যে কোনও ধরনের, এমনকি ছোটখাটো বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ওপরেও, বেপরোয়া পুলিশী জুলুম-হামলা নেমে আসছে।

অন্যদিকে, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে আইনব্যবস্থার ভূমিকার পরিবর্তনটাও নজর করার। আমরা শুনেছি ধর্মঘট করার আইনী অধিকার সবারই আছে। অথচ, ২০০২এ-ই তামিলনাড়ু সরকার আইন করে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেয়; ২০০৩এ খোদ সুপ্রিম কোর্ট সরকারি এই আইনের পক্ষে ছাপ্পা মেরে দেয়। এই একটা রায়ের ওপর ভরসা করে সেই সময় তামিলনাড়ুর প্রায় সাড়ে তিন লাখ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কার্যত নাকে খত দিয়ে কাজে ঢুকতে হয়েছিল। প্রায় একই সময় কেরল সরকারও একই ধরনের আইন চালু করে। এবং এক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট সরকারের লাগু করা নয়া আইনের স্বপক্ষেই রায় দেয়। আরও আগে ২০০১এ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টের বেশ কিছু বড় রকমের সংশোধনী আনা হয়, যার মধ্যে অন্যতম হল, EPZ ও SEZ-র অন্তর্গত কারখানাগুলিতে ইউনিয়ন করার ও ধর্মঘট করার ওপর একগুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ করা। ২০০৫এ শ্রমিকদের এতদিনকার নানান চালু আইনী অধিকার কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার "শ্রম আইন সংশোধন" করার কথা বলে। নানা কারণে আজ অব্দি এই "সংশোধনী" আইনী স্বীকৃতি পায়নি এটা ঠিক; কিন্তু, বাস্তবে এই সংশোধনীগুলি ইতিমধ্যেই নানাভাবে কার্যকরী হয়ে চলেছে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে চালু আইনী ব্যবস্থা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

বিষয়টা শুধুমাত্র পুলিশের আরও খানিকটা আগ্রাসী হওয়া বা আইনব্যবস্থার আরও খোলাখুলি মালিকশ্রেণীদের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া — এর মধ্যেই আটকে নেই। আমরা সাধারণভাবে জানি, মালিকশ্রেণী প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষের ওপর যে বেপরোয়া শোষণ-লুণ্ঠন চালায়, তা যাতে চোখের আড়ালে থেকে যেতে পারে, তার জন্যেই রাষ্ট্রের একটা আপাত নিরপেক্ষ চেহারা তুলে ধরা মালিকশ্রেণীদেরই দরকার পড়ে। আর তার জন্যে তাদের দরকার মতো পুলিশবাহিনীকে খানিকটা লাগাম পড়িয়ে রাখতে হয় বা আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কখনও কখনও কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। যে কারণে অতীতেও নানা সময় আমরা দেখেছি পুলিশ-সরকারি আমলা বা এমনকি রাজনৈতিক নেতারা বাড়াবাড়ি করে ফেললে চালু আইনের মধ্যেই কিছু ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। **সেক্ষেত্রে, আজকের অবস্থাটা ঠিক কী রকম ?** একদিকে, নয়া অর্থনৈতিক নীতির পর্বে বেশি মুনাফার লোভে দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণী বেপরোয়া পাগল হয়ে উঠেছে, কোনও বাধাই তারা সহ্য করতে রাজিনয়; অন্যদিকে, তাদের এই হামলার বিরুদ্ধে পুরোনো পার্টিদের বাদ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তলাকার গরিব মানুষের মধ্যে থেকে ক্রমশ একটা প্রতিরোধ স্বাধীনভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে; এবং পুরোনো পার্টিদের হাত ধরে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-প্রতিরোধগুলোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় মালিকশ্রেণীরা মনে করছে যে তাদের যদি অবাধে লুঠতরাজ চালাতে হয়, তাহলে বর্তমানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যেটুকুও বা সিকি গণতন্ত্র আছে, তারও খোলনলচের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটানো দরকার। কেননা, খেয়াল করুন, এসমা-নাসা জাতীয় চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক একগুচ্ছ আইন এই পর্বের আগে থেকেই ওদের হাতে মজুত ছিল। এবং, এই পর্বেই সেগুলোকেও ওরা দরকারমতো কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু, বিশেষভাবে ২০০০ সালের পর থেকে ওরা মনে করছে এগুলোই যথেষ্ট নয়, ওদের অবাধ লুঠতরাজ চালানোর প্রয়োজনে ওদের দরকার রাষ্ট্রের আরও অনেক বেশি স্বৈরতান্ত্রিকীকরণ। কেননা, ওরা জানে তুলনামূলক গণতান্ত্রিক পরিবেশ মানেই সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তুলনামূলক অনুকূল পরিস্থিতি। ফলে, ওরা দরকারমতো আইনের বদল ঘটাচ্ছে, পুলিশীব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছে, "মাওবাদী" ইত্যাদি নানা কিছুর জুজু দেখিয়ে একটা অনেক বেশি সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল তৈরি করে চলেছে এবং সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে, যেখানে স্বাধীনভাবে সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলাটাই শুধু অপরাধ নয়, এমনকি সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলা ও সেই সংগ্রামগুলোর পাশে দাঁড়াতে চাওয়াটাও "অপরাধ"

বলে গণ্য করা হবে, পুলিশ এই "অপরাধে" আপনাকে গ্রেফতার করবে, এবং কোর্ট কাছারি সেগুলোকে আইনী ছাপ্পা মেরে দেবে। আজকে যেহেতু সংগ্রামগুলো সবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে, এখনও ব্যাপ্ত চেহারা নিয়ে সমাজে হাজির হয়নি, সেইজন্যে সংগ্রাম-সংগঠনের কথা বলার "অপরাধ"কে "মাওবাদী" মোড়ক লাগিয়ে ওদের আড়াল করতে হচ্ছে, আগামীতে নতুন ধারার সংগ্রাম যত বেশি ব্যাপ্ত হবে, তত এই মোড়কটাকেও ওরা খুলে ফেলবে এবং সংগ্রাম-সংগঠন করা বা কেবলমাত্র সংগ্রাম-সংগঠনের কথা বলার "অপরাধেই" আপনাকে ওরা গলা টিপে মারতে চাইবে। আর, এই ব্যাপারটাই ঘটেছে "মাওবাদী" ছাপ্পা মেরে মিঠু ঘোষকে গ্রেফতার ও সাথে সাথে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ মোট ১২ জনের নামে একতরফা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ জুড়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে।

এটা ঠিক, আপাতত মিঠু ঘোষ জামিন পেল। কিন্তু, এখনও তার ঘাড়ে ও সাথে সাথে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটির আরও ১২ জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা মামলা উঠে গেল না। যে বিপদ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে তারা রেহাই পেলেন না। আর শুধু তাই নয়, মিঠু ঘোষের জামিনের মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে সংগ্রাম-সংগঠনের অধিকারের ওপর যে বড় রকমের খাঁড়া নেমে আসছে, তা বিন্দুমাত্র কমে গেল না।

একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, হাতে খুবই কম সময় পড়ে আছে। এমনিতেই ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে খুব সামান্য। সেটুকুকেও কেড়ে নিয়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোকে আরও বেশি বেশি করে স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা দেওয়ার একটা চক্রান্ত চারদিক থেকে চলছে। দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দিকে তাকিয়ে ডান-বাম সবকটা পুরোনো পার্টিই এই চক্রান্তে সমানভাবে অংশীদার। এখনই যদি তৈরি না হওয়া যায়, যেটুকু ছিটেফোঁটা গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে, শুধু তাকে রক্ষা করাই নয়, সেই অধিকারকে বাড়ানোর সংগ্রাম, ও এই অধিকারকে বাড়াতে বাড়াতেই বর্তমান অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে আমূল পালটানোর সংগ্রামের জন্য এখনই যদি তৈরি না হওয়া যায়, সামনে আরও সাংঘাতিক সময় আসতে চলেছে। এখনই তৈরি হোন, সামনে ভয়ংকর দিন আসতে চলেছে।

মে দিবসের প্রাক্কালে শ্রমিক আন্দোলনে সিটুর আরও এক অবদান –

লড়াকু শ্রমিকনেতাকে খুন

ওরা খুন করল রামপ্রবেশ সিং-কে। রামপ্রবেশ সিং — সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিক ও তাদের স্বাধীন ইউনিয়নের নেতা। খুন করল সিটু-র গুন্ডাবাহিনী। খুন করল ১০ই মার্চ — সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিকদের স্বাধীন ইউনিয়নের ডাকা লাগাতার ৪৮ ঘণ্টা ধর্মঘটের প্রথম দিনেই। সেদিন ওরা শুধু রামপ্রবেশকেই খুন করেনি, তার সাথে বেপরোয়া হামলা করে আরও অন্তত ১৫ জন শ্রমিককে রীতিমতো রক্তাক্ত-আহত করেছে।

কেন খুন হতে হল রামপ্রবেশকে ? ওর অপরাধ কী ? ওর অপরাধ এটাই যে ও সি ই এস সি ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ঠিকা শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত করছিল, একজন সত্যিকারের লড়াকু শ্রমিক নেতা হিসেবে তাদের লড়াইকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, ধর্মঘটের সমর্থনে ১০ই মার্চ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে প্রচার করছিল। ভারতবর্ষের বড় পুঁজিপতিদের এক প্রতিভূ আর পি গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী অতিমুনাফার লোভে যে কাজ এক সময় স্থায়ী শ্রমিকদের দিয়ে করাত, সেই কাজ আজ যখন অনেক কম পয়সায় ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে করায় — **সেটা কিন্তু কোনও অপরাধ হয় না!** দিনে মাত্র ১০০ টাকা রোজ — তাও কাজ থাকলে পয়সা, না থাকলে পয়সা নেই, ইএসআই-পিএফ-গ্র্যাচুইটির বালাই নেই — এরকম এক অবস্থায় ১,৩৩,০০০ Volt থেকে শুরু করে ২২০ Volt পর্যন্ত হাই টেনশন/লো টেনশনের ইলেকট্রিক লাইনে এই শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো — জান হাতে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জ্যান্ত ইলেকট্রিক লাইনে শক খেয়ে বা Cable Blast -এ মুহূর্তে পুড়ে এদের কাঠকয়লা হয়ে যাওয়া, অথচ দুর্ঘটনায় মরেছে বলে পাছে এদের বউ-বাচ্চাকে কমপেনসেশন দিতে হয়, তার জন্য

ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এদের লাশ হাপিশ করে দেওয়া — **এগুলোও কিন্তু কোনও অপরাধ বলেই গণ্য হয় না!!** হাই টেনশন/লো টেনশন ইলেকট্রিক লাইনে বছরের পর বছর এদের দিয়ে কাজ করানো হবে, অথচ সরকারি কানুনে এদের বলা হবে "মাটি কাটার লোক" — **সেটাই বা কি এমন বড় অপরাধ!!** দালাল পাঠিয়ে বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে কাজ করানোর জন্য নিয়ে আসা এই পাঁচ-ছ হাজার দেহাতি দলিত শ্রমিকদের মাথায় বছরের পর বছর কাঁঠাল ভেঙে CITU-INTUC-AITUC-HMS চার ইউনিয়নের নেতারা সম্পত্তির পাহাড় বানিয়ে ফেলল — **সেটাকেই বা কে আর বলে অপরাধ!! অপরাধ হল** পুরোনো ইউনিয়নগুলোর দালালি-বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, **অপরাধ হল** নিজেদের আলাদা ইউনিয়ন গড়ে তোলা, **অপরাধ হল** সি ই এস সি ম্যানেজমেন্টের শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে ঝান্ডা তোলা, ৪৮ ঘণ্টা লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়ে সি ই এস সি ম্যানেজমেন্টকে চাপে ফেলা। **আর এই অপরাধের ফলেই** রামপ্রবেশকে মরতে হল, আহত হতে হল আরও জনা পনেরো লড়াকু শ্রমিককে।

রামপ্রবেশদের অপরাধ কি শুধু এটুকুই ? ওরা যে এসবের থেকেও আরও সাংঘাতিক একটা অপরাধ করে ফেলেছে! ওরা শুধু নতুন একটা ইউনিয়ন-ই গড়ে তোলেনি, ইউনিয়ন তৈরির সময় ওরা ঠিক করেছে — ওরা কোনও পুরোনো পার্টিওয়ালাদের দ্বারস্থ হবে না, ধোপদুরস্ত পোষাকের বাইরের "শিক্ষিত" "বাবু" কোনও নেতাও ওদের আর নাকি চাই না। ওদের ইউনিয়ন ওরা নিজেরাই চালাবে, ঠিক করলে সবাই মিলে ঠিক করবে, ভুল করলে তার জিম্মাও সবাই মিলেই নেবে। **ভাবুন তো কত বড় সাংঘাতিক অপরাধ — সব জায়গাতেই শ্রমিকরা সবাই মিলে একবার যদি এদের মতো করে ভাবতে শুরু করে, তাহলে পুরোনো পার্টিওয়ালাদের এতদিনকার জমিদারি-করে কম্মে খাওয়া — সব যে ডকে উঠতে শুরু করবে!!** কাজেই দরকারে রামপ্রবেশদের জানে মেরে হলেও ওদের এগোনোকে আটকাতে হবে না কি!!

দুনিয়া জুড়েই শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষদের দলে-পিষে মেরে ঝড়ের গতিতে এগোতে চাইছে বিশ্বায়নের রথের চাকা। অতিমুনাফার লোভে পাগল হয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের দোসর আলাদা আলাদা দেশের মালিকশ্রেণীরা তাদের এগোনোর পথে বিন্দুমাত্র বাধা সহ্য করতে পারছে না। স্থায়ী চাকরি — এখন ইতিহাস। ঠিকা-ক্যাজুয়াল-টেম্পোরারি-বদলি চাকরি — এটাই এখন নিয়ম! রক্তাক্ত লড়াই করে অর্জন করা আট ঘণ্টা কাজের সময় — উঠে যাচ্ছে।ESI-PF-Pension-Gratuity-DA-Increment-Canteen-Leave— হাতছাড়া হতে বসেছে। দেশে দেশে দক্ষিণপন্থীই হোক, আর বামপন্থী— সবকটা পুরোনো পার্টি মালিকশ্রেণীদের অবাধ লুঠের দেখভালের কাজে সদাব্যস্ত হয়ে থাকছে।

দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষ ওদের এই বেপরোয়া হামলার সামনে দিশেহারা, বিপর্যস্ত। কাদের ওপর ভরসা করে বাঁচবেন তারা ? পুরোনো সব কটা পার্টি যে পচে গেছে। নতুন কোনও পার্টিও তো তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে না, যারা সত্যিই গরিব মানুষের সত্যিকার স্বার্থকে মাথায় রেখে এই সব হামলাকে মোকাবিলা করার কথা বলবে, শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাবে। অথচ এদিকে হামলাগুলোও তো আর মানা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ক্রমশই তারা বেছে নিচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের রাস্তা। বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে এই বিদ্রোহগুলো বেশি বেশি করে চোখে পড়ছে। আর বিদ্রোহ করতে করতেই শ্রমিক-কৃষকরা দেখছেন পুরোনো সব পার্টিগুলো কীভাবে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, আর মালিকশ্রেণীর নীতিগুলোকে রক্ষা করার কাজে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এতদিন ধরে পুরোনো নেতা আর সংগঠনগুলোর ওপর ভরসা করে অন্ধভাবে তাদের কথায় চলার পরিণতি কী হয়, সেটা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এই অবস্থায়, ভরসা করার মতো সামনে নতুন কিছু দেখতে না পেয়ে এবার তারা তাকাতে শুরু করছেন নিজেদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত শক্তির ওপর, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার লড়াইএর নতুন স্বাধীন সংগঠনও তারা গড়ে তুলতে শুরু করেছেন, ঘাড়ের ওপর চেপে বসে নেতারা তাদের চালাবে, পুরোনো এই চিন্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে এখন তারা নিজেরাই নিজেদের সংগ্রামের মধ্যে থেকে নতুন নেতাদের জন্ম দিতে শুরু করেছেন, নিজেরা সবাই মিলে নেতাদের ঘাড়ে চেপে বসে তাদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছেন। নিঃসন্দেহে এখনও পর্যন্ত এই সব কিছুই চলছে খুবই প্রাথমিক স্তরে, অনেকটাই হয়তো বাইরে থেকে চোখে পড়ছে না, কিন্তু একথা সত্যি শ্রেণীসংগ্রামের এই নতুন ধারা নানান বিচিত্র চেহারা নিয়ে ক্রমশই একটু একটু করে চোখের সামনে স্পষ্ট হতে

শুরু করেছে। এবং তা শুধু পশ্চিমবাংলা বা ভারতবর্ষ জুড়ে হচ্ছে তাই নয়, পৃথিবী জুড়েই বাড়তে শুরু করেছে।

২০০৬এর মার্চে সি ই এস সি ঠিকা শ্রমিকদের বিদ্রোহ, এই বিদ্রোহের ওপর দাঁড়িয়ে চারটে পুরোনো ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের নতুন ইউনিয়ন তৈরি করা, ইউনিয়ন তৈরির শুরুর পর্বেই পুরোনো অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে তাদের ঐ সাহসী সিদ্ধান্ত — তারা কোনও পুরোনো পার্টিওয়ালাদের দ্বারস্থ হবে না, ধোপদুরস্ত পোষাক পড়া বাইরের "শিক্ষিত" "বাবু" কোনও নেতাও তাদের আর চাই না। তাদের ইউনিয়ন তারা নিজেরাই চালাবে, ঠিক করলে সবাই মিলে ঠিক করবে, ভুল করলে তার জিম্মাও সবাই মিলেই নেবে — এই সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা ও পুরোনো চার ইউনিয়নের সমস্ত বিরোধিতাকে মোকাবিলা করে, সরকার-প্রশাসন-লেবার দপ্তরের উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে ম্যানেজমেন্টের সাথে লাগাতার পাঞ্জা কষে যাওয়া, তার অংশ হিসেবে ১০ ও ১১ই মার্চ ৪৮ ঘণ্টা লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া, রামপ্রবেশের খুনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে, বরং এই খুনের প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটকে ৭২ ঘণ্টায় পরিণত করা, ১২ই মার্চ ভিক্টোরিয়া হাউসে ও পোদ্দার কোর্টে সি ই এস সি-র সদর অফিসে জঙ্গি বিক্ষোভে ফেটে পড়া, কলকাতা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সি ই এস সি-র বিভিন্ন গিয়ারের সাথে যুক্ত থাকা প্রতিটি ঠিকা শ্রমিকের তাদের মৃত বীর নেতার ছবি স্পর্শ করে শেষদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়া — এ সবই তাই বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমী কোনও ঘটনা নয়, বরং শ্রেণীসংগ্রাম আবার তার নিজের মতো করে একটু একটু করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, তারই যেন আর এক টুকরো ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসছে। তেমনই রামপ্রবেশকে খুন করে সি পি আই (এম)-ও আর একবার প্রমাণ করে দিচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশের পথে বাধা হিসেবে দাঁড়াতে কতদূর পর্যন্ত তারা যেতে পারে। ■

নন্দীগ্রামে পুলিশ-প্রশাসনের মদতে সি পি এম-এর সন্ত্রাসই শেষ কথা হতে পারে না

লাল পতাকা উড়িয়ে বাইকবাহিনীর দাপাদাপি, সন্ধে নামতে না নামতে বোমা-গুলির রাজ, মহিলাদের ওপর ঘৃণ্য অত্যাচার, ঘরছাড়াদের লম্বা মিছিল — সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই তো নন্দীগ্রাম! সমস্ত আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সি পি এম-এর তাঁবেদারি করতে প্রশাসনের খুল্লমখুল্লা ময়দানে নেমে পড়া — নন্দীগ্রাম থানার ও সি-র খোলাখুলি সি পি এম-এর ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুন্ডামি করে যাওয়া, বিমান বসুর এক হুকুমে বুদ্ধিজীবীদের নন্দীগ্রামে যেতে মানা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ, হাওড়া জেলার এস ডি ও-র রাস্তায় নেমে সেই নির্দেশ কার্যকরী করা, লক্ষ্মণ শেঠের টেলিফোনে সি আর পি এফের প্রধান অলোক রাজকে হুমকি দেওয়া — আজকের নন্দীগ্রামে পুলিশ-প্রশাসন মানে তো এটাই!

পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী শ্রমিকদের কাছে এই সি পি এম একেবারে অচেনা নয়। যারা সি ই এস সি ম্যানেজমেন্টের হয়ে ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ভাঙতে তাদের সংগ্রামী নেতা রামপ্রবেশ সিং-কে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলে দিতে পারে, যারা জুট শ্রমিকদের বিদ্রোহকে দমন করতে ভিখারি পাসোয়ানকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারে, যারা শ্রমিকদের ঘাড় ধরে মালিকদের শ্রমিকবিরোধী কালা শর্তের পাহাড় মেনে নিতে বাধ্য করে, যারা কারখানায় মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজমেন্টের হয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে বাড়তি উৎপাদন বুঝে নেয় — তাদের কাছ থেকে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী শ্রমিকরা এখন আর অন্য কী আশা করবেন ? আর তাই, আজকে নন্দীগ্রামের এই সন্ত্রাসে ভেতরে ভেতরে তারা ফুঁসে উঠতে চান, এই সন্ত্রাস আর তাদের ওপর প্রতিদিন জারি থাকা সি পি এম মার্কা পার্টিগুলোর মদতে মালিকশ্রেণীর সন্ত্রাস (যে সন্ত্রাস বাইরে থেকে প্রায় কেউ-ই দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না) কোথাও তাদের কাছে একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু, তারা কষ্ট পান, যখন তারা দেখেন —আজ নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষেরা প্রাণে বাঁচার তাগিদে সি আর

পি এফ জওয়ানের পা জড়িয়ে ধরছেন, অলোক রাজকে আজ তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখছেন।

কারণ, তাদের বুকের ভেতর সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা নন্দীগ্রামের অন্য আরেক ছবির সাথে আজকের এই ছবি — মেলে না। গোটা দেশের আগুয়ান শ্রমিকদের কাছে ২০০৭এর ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রাম জুড়ে দাপাদাপি করে বেড়ানো সি পি এম-এর গুন্ডাবাহিনীর সন্ত্রাস ও নৃশংস গণহত্যা — এটাই তো একমাত্র ছবি নয়। এই শ্রমিকরা নিজের চোখেই তো দেখেছিলেন ১৪ই মার্চের ওরকম সন্ত্রাসের পর ১৬ই মার্চ এই মানুষরা বীরের মতো ফের কীভাবে মাথা তুলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। দুই শহীদের মৃতদেহ নিয়ে কয়েকশো মানুষের মিছিলের মধ্যে দিয়ে যার শুরুয়াৎ, সোনাচূড়া পৌঁছোতে পৌঁছোতে সেই মিছিলের ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষের উত্তপ্ত মিছিলে পরিণত হওয়া, মিছিলের সেই চেহারা দেখে সি পি এম-এর ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর ভয়ে লেজ গুটিয়ে সোনাচূড়া ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, পুলিশের পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এবং ফের নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের সোনাচূড়া দখল নেওয়া — এ সবই তো, গোটা দেশের আগুয়ান শ্রমিকরা, দেখেছেন, নজর করেছেন, নন্দীগ্রামের এই সমস্ত বীর সংগ্রামী সাথীদের সাথে নিজেদের তারা একাত্ম করেছেন। আর তাই, সেদিনের সেই বীর সংগ্রামী সাথীরা আজ যখন নিজেদের সেই সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ শক্তির তাকতের দিকে না তাকিয়ে প্রাণে বাঁচতে ভরসা করেন সি আর পি এফ জওয়ানদের ওপর, অলোক রাজকে দেখেন তাদের মেসিয়াহ্ হিসেবে — তখন আগুয়ান শ্রমিকদের বুক দুঃখে ভেঙে যায়, সি পি এম-এর নৃশংস সন্ত্রাসের থেকেও সেদিনের সংগ্রামী সাথীদের আজকের এই পরিণতি দেখে তারা বেশি কাতর হন।

আর, শুধু ১৬ই মার্চ কেন ? ভুলব আমরা ৩রা জানুয়ারি, ২০০৭ এবং তার পরের অন্তত প্রথম চার/পাঁচ মাসের বর্ণময় সেই প্রতিটা দিনের কথা ? বুদ্ধবাবুরা তখনও পর্যন্ত ২৩৫টা সিট জয়ের নেশায় বুঁদ — তারা ধরে নিয়েছে, পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কৃষক গরিব মানুষেরা তো ওদের পোষা দাস — কেননা, এই মানুষেরা ওদের ভোট দেয়, ওদের খাতায় নাম লিখিয়ে ঝান্ডা উঁচিয়ে ওদের হয়ে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" করে। ৩রা জানুয়ারি, ২০০৭ জমি অধিগ্রহণের নোটিশ ছিঁড়ে ফেলে নন্দীগ্রামের মানুষরা প্রমাণ রাখলেন — তারা সি পি এম-এর ঝান্ডা কাঁধে ঘুরে বেড়ান মানেই এটা নয় যে তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে যা ইচ্ছে করার অধিকারের দাসখৎ তারা সি পি এম-এর কাছে লিখে দিয়েছেন। এখানেই তো শেষ নয়। ভুলব আমরা নন্দীগ্রামের প্রায় সমস্ত গরিব মানুষের পুরোনো পার্টি ভাগাভাগি ভুলে "ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি"-র ঝান্ডার তলায় জড়ো হওয়া, লড়াইএর রাশ নিজেদের হাতে রেখে নিজেদের উদ্যোগে একটার পর একটা সাহসী আর বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে নন্দীগ্রামকে কার্যত একটা প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করা!

কম তো হামলা নামেনি সেই পর্বেও তাঁদের ওপরে! আগুয়ান শ্রমিকরা আগ্রহের সাথেই নজর রেখেছিলেন সেই পর্বের ঘটনাবলীর ওপরেও! এবং তারা দেখেছেন সেই পর্বে হামলা চালিয়ে নন্দীগ্রামে তাদের সাথীদের শুধু ভাঙা যায়নি, তাই নয়; ওরকম হামলার সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন তাদের সাথীরা কারও পা জড়িয়ে ধরে বাঁচার কথা ভাবেননি, নিজেদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত শক্তির জোরে বারবার সে সময় সেই হামলাকে তারা প্রতিরোধ করেছেন। কোন নেতা বা পার্টি সেদিন তাদের সেই প্রতিরোধের শক্তি ছিল না, শক্তি লুকিয়ে ছিল সাধারণ গরিব মানুষদের স্বাধীন উদ্যোগের মধ্যে, নেতৃত্ব তাদের নিজেদের হাতে রাখার মধ্যে, নেতৃত্বের রাশ-লাগাম (Control)-ও নিজেদের হাতে রাখার মধ্যে।

যে শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী গরিব মানুষরা যাত্রা শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত নিজেদের সেই শক্তির ওপর ভরসা তারা রাখতে পারলেন না। লড়াইকে এগোতে গিয়ে একগুচ্ছ সমস্যাকে মোকাবিলা করার সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা পা দিলেন সেই পুরোনো পার্টিওয়ালাদের ফাঁদেই — সি পি এম-কে রুখতে দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের চক্করে। তারা যেটা দেখলেন না, তা হল —বাস্তবে তাদের লড়তে হচ্ছে দেশী-বিদেশী মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরি শিল্পায়নের নামে জমি অধিগ্রহণের নীতির বিরুদ্ধে, সি পি এম মালিকশ্রেণীদের এই নীতিটার একজন ফেরিওয়ালা মাত্র। এবং সি পি এম একা নয়, ভোটে জিতে গদি দখলের রাজনীতি করা ডান-বাম সব কটা পার্টিই এই নীতির ফেরিওয়ালা। তৃণমূল কংগ্রেস-ও এর ব্যতিক্রম নয়। সি পি এম-এর সাথে তাদের লড়াই কেবল সরকারি গদি কার দখলে থাকবে, তার লড়াই। তৃণমূলের ফাঁদে পা দেওয়ার এই ভুল সিঙ্গুরের সংগ্রামী কৃষকরাও করেছিলেন, নন্দীগ্রামের সংগ্রামী গরিব মানুষরাও করলেন। আর নন্দীগ্রামের

এই সমস্ত গরিব মানুষ যে ক্ষমতার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন ১৬ই মার্চের ঘটনায়, তৃণমূল সেই ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মেরে তাদের সমস্ত সক্রিয়তাকে ঘুরিয়ে দিল আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে। বাস্তব প্রতিরোধের ময়দানে এই মানুষেরা যত বেশি বেশি করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে লাগলেন, লড়াইয়ের রাশ-নেতৃত্ব যত বেশি বেশি করে নিজেদের হাত থেকে সরিয়ে তুলে দিতে থাকলেন তৃণমূলের হাতে, তত বেশি করে সি পি এম-এর সুবিধা হয়ে গেল একটা নৃশংস সন্ত্রাস নামিয়ে এই প্রতিরোধকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে — ১৪ই মার্চ যেটা সম্ভব হয়নি, সেটাই সম্ভব হল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এসে। আর, আজ নন্দীগ্রামে যা কিছু ঘটছে, তা ঘটছে নভেম্বরের ধারাবাহিকতাতেই — নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের ভুলের ধারাবাহিকতাতেই।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের নন্দীগ্রামই শেষ কথা হতে পারে না, হবেও না। নিজেদের জোরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে স্বাদ নন্দীগ্রামের সংগ্রামী সাথীরা একবার পেয়েছেন, নিজেদের সংগঠন নিজেরাই চালানোর যে শক্তিটা একবার তারা অর্জন করেছেন, আজ সাময়িকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দিতে পারলেও, তৃণমূলের ফাঁদে খুব বেশিদিনের জন্য তাদের আটকে রাখা যাবে না। সি পি এম ভাবছে — এইভাবে ভয়ংকর, নৃশংস সন্ত্রাস চালিয়ে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাওয়া এই সমস্ত সংগ্রামী জনগণের মনে ওরা ভয় ঢুকিয়ে দেবে; আর এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে নতুনভাবে মাথা চাড়া দিতে চাওয়া এই সমস্ত স্বাধীন সংগ্রামগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের টেনে দেওয়া রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে আশ্রয় নেবে; এবং তার মধ্যে দিয়ে মালিকশ্রেণীদের স্বার্থরক্ষা করার রাজনীতি ওরা সবাই মিলে মিলিজুলিভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। ওরা পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনগণকে এই জায়গায় আটকে রাখতে চাইছে — হয় তুমি সি পি এম, নয় তুমি তৃণমূল; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শুধু নন্দীগ্রাম কেন, পশ্চিমবাংলায় নতুনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করা শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষদের এই সংগ্রামগুলোর কোনওটাকেই খুব বেশিদিনের জন্য সেই গণ্ডির মধ্যে ওরা আটকে রাখতে পারবে না। আজকের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম আবারও দৃপ্ত চেহারা নিয়ে জ্বলে উঠবে; তার এবারের জ্বলে ওঠা হবে নতুন অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে উন্নত চেতনা নিয়ে জ্বলে ওঠা। আর সেদিনই, আজকের সন্ত্রাসের, পুলিশ-প্রশাসনের এরকম নগ্ন ভূমিকার, তারা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব মেটাবেন — অবশ্যই নতুন চেহারায়, শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনীতির নতুন ঝান্ডাকে সজোরে আঁকড়ে ধরেই। প্রশ্ন হল, নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষদের এই নতুন চেহারায় পেতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশের যে ভূমিকা নিতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনীতির নতুন ঝান্ডাকে সমাজে সজোরে হাজির করার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বটা যে তাদেরকেই নিতে হবে, এই চেতনার জায়গা থেকে তারা নিজেরা প্রস্তুত হবেন কি না। না হলে, নন্দীগ্রামের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের আজকের এরকমের পরিণতি বারবার ঘটবে, এই সংগ্রামগুলো শুধুমাত্র তার নিজের শক্তিতেই স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ■

মূল্যবৃদ্ধির চাপ ঘাড়ে চেপে বসছে — কী করবেন ?

বাড়ছে চালের দাম। রান্নার তেলের দাম ইতিমধ্যেই আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে। বেড়ে চলেছে আটা-ডাল সহ সমস্ত রোজকার খাবার জিনিষের দাম। ন্যূনতম খাবারের সংস্থানটুকু করাও গরিব মানুষদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

উন্নয়ন-শিল্পায়ন নিয়ে আজকাল পার্টিওয়ালারা প্রচুর ভাষণ দিয়ে চলেছে। কিন্তু, ওরা জবাব দেবে কি — চীনের তুলনায় আমাদের দেশে দেড়গুণ বেশি চাষের জমি থাকা সত্ত্বেও কী করে চীনে আমাদের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ? কী করে উত্তর কোরিয়ায় প্রতি হেক্টর চাষের জমিতে আমাদের দেশের তুলনায় তিনগুণ বেশি চাল জন্মায় ? হল্যান্ডে কেন প্রতি হেক্টর চাষের জমিতে আমাদের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি গম জন্মায় ? কেন আমাদের দেশে চাষবাস এখনও প্রায় পুরোটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ? কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি বলতে যা কিছু বোঝায়, তার সমস্ত কিছুর বিচারেই কেন আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে ?

গ্রাম থেকে যে শ্রমিকরা শহরে কাজ করতে আসেন, নিজেরাই দেখেছেন একসময় মাইলের পর মাইল যে

জমিতে ধান-গম চাষ হত, এখন সেখানে ফুল-ফলের চাষ হয়। একেই পিছিয়ে থাকা অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর জন্য আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার কম, তার ওপর নয়া অর্থনৈতিক নীতির যুগে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভোটবাজ পার্টিওয়ালারাই কি চাষীদের রাতারাতি বেশি লাভের লোভ দেখিয়ে ধান-গমের বদলে এগুলো চাষ করতে প্রলুব্ধ করছে না ? ওরা ভাবছে আমরা ভুলে গেছি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হরিয়ানায় কৃষকদের এক সভায় বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক সেই পরামর্শ — "আপনারা ধান-গমের বাইরে একটু ভাবতে শিখুন, ফুল-ফল-তৈলবীজ-সব্জি উৎপাদনে নজর দিন। ওতে লাভ বেশি আর ওগুলো বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে।" **এ পরামর্শ তো শুধু ব্যক্তি বাজপেয়ী বা আলাদাভাবে বি জে পি পার্টির নয়, বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতির প্রবক্তা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন গোটা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া আর তাদের তল্পিবাহক আমাদের দেশের মালিকশ্রেণীদের পরামর্শই তো বাজপেয়ীর মুখ দিয়ে সেদিন ওভাবে কৃষকদের সামনে এসেছিল। আর, তাই তো মনমোহন-বুদ্ধ-বাজপেয়ী-মমতা কারোরই এই নীতির বিরোধিতা করার সাহস হয় না**, ওদিকে আমাদের চোখের সামনে হাওড়া-মেদিনীপুর-দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাগুলোতেও ধান-গমের বদলে ফুল-ফল-তৈলবীজ-সব্জি চাষ প্রবল বিক্রমে বেড়ে চলে।

এখন এরাই আবার, খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার কমে যাচ্ছে বলে বাজার গরম করে চলেছে। আর সেই অজুহাতে অনেক বেশি দাম দিয়ে বিদেশ থেকে ঢালাও গম-ভোজ্যতেল আমদনির জন্য নানান আইনি বন্দোবস্ত করে চলেছে। আসলে কিন্তু আমদনি করা হচ্ছে আমাদের দেশে কম গম উৎপন্ন হচ্ছে বলে নয় !! ২০০৬এ খোদ আমেরিকার কৃষি দপ্তরের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, সে বছর আমদানি করা মোট ৩৫ লক্ষ টন গমের মধ্যে ২০ লক্ষ টন গম আমেরিকা নিজেই ভারতবর্ষকে তার দেশ থেকে কিনতে হুকুম করেছে! **সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের মুনাফার স্বার্থে আমাদের দেশে যাতে ধান-গমের চাষ কম হয়, তারও আয়োজন করবে, আবার তারপর ওদের দেশ থেকেই বেশি দাম দিয়ে আমরা যাতে খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হই, তারই হুকুম দেবে। ধন্য আমাদের স্বাধীনতা, ধন্য আমাদের গণতন্ত্র!!**

ভোজ্যতেলের ব্যাপারটাও প্রায় একই রকম। বাজার ছেয়ে গেছে সূর্যমুখী তেল-তুষের তেল-রেপসিড-পাম তেল আরও কত রকম তেলে! কেন ? না, ওগুলো বিক্রি হলে দেশী-বিদেশী ভোজ্যতেলের কোম্পানীগুলোর বেশি লাভ। আর তাই, ওদের লাভ যাতে হয়, তার জন্য আমাদের সরকারগুলো বিদেশ থেকে বেশি দামে এই সমস্ত তেল আমদানি করে। বিদেশের বাজারে এ বছর এগুলোর দাম বেড়ে গেছে, কাজে কাজেই আমাদেরও খোলাবাজার থেকে বাড়তি দামে সেই তেল কিনতে হচ্ছে। ওদের লাভে খামতি নেই, মরতে মরছি আমি আপনি – সাধারণ ছাপোষা গরিব মানুষ। **আমার দেশের অধিকাংশ মানুষ একবেলাও খেতে পায় না, ওদিকে আমাদের চাল রপ্তানি হয়ে চলে যায় বিদেশের বাজারে** — বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের সিন্দুক ভরে তোলার জন্য!! তাতে লাভ কাদের ? আমার-আপনার কী লাভ জানি না, দেশের পুঁজিপতি-জোতদারদের যে লাভ, তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতি মেনে সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে আমাদের দেশে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে কার্যত তুলে দেওয়া হচ্ছে। গরিব মানুষকে খোলাবাজার থেকে বেশি দাম দিয়ে চাল-গম কিনে খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। ফুড কর্পোরেশনের দপ্তরগুলোকে একে একে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। **অন্যদিকে, দেশী-বিদেশী কোম্পানী আর শেয়ারবাজারের ফাটকাবাজরা বাজার থেকে কম দামে খাদ্যশস্য তুলে নিয়ে জমিয়ে রাখছে ঠান্ডাঘরে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এরা কম দাম দিয়ে কোম্পানীগুলোর শেয়ার কিনত পরে বেশি দাম দিয়ে বেচার জন্য, আজকাল তারাই ফাটকা খেলছে খাদ্যশস্য-জ্বালানি তেল এগুলো নিয়ে। তারা এগুলো কম দাম দিয়ে কিনে জমিয়ে রাখছে সময় ও সুযোগ মতো ফাটকাবাজি করে অনেক বেশি পয়সা কামাই করবে বলে। এখন আবার "ফিউচার ট্রেডিং"-এর নামে এই ফাটকাবাজিকে একেবারে আইনী স্বীকৃতি পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে!** আর এই ঘটনা আজকে চলছে শুধু আমাদের দেশেই নয়, চলছে গোটা দুনিয়া জুড়েই। এর ফলে, আমার-আপনার কিনে খাওয়ার জন্য পড়ে থাকছে যে খোলাবাজার, সেখানে তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম খাদ্যসঙ্কট। খোলাবাজারে চাল-গম-তেলের জোগান কম – এই ধুয়ো তুলে বাজারে হু হু করে বেড়ে চলেছে এগুলোর দাম।

ফাটকাবাজ-বড় ব্যবসাদারদের পক্ষে ইচ্ছেমতো খাদ্যদ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে আরও সুবিধা হয়ে গেছে, কারণ নয়া অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশে জনসংখ্যার ওপরতলার ১২ থেকে ১৫ শতাংশের হাতে

প্রচুর পয়সা আসছে, তাদের পছন্দসই খাবারের জন্য যে কোনও দাম দিতে তাদের সমস্যা হচ্ছেনা। ফলে, তলাকার ৯০-১০০ কোটি গরিব মানুষ খেতে না পেলেও তাদের কোনও সমস্যা নেই, ওপরতলার ১৫-২০ কোটি লোকজনের বাজারটা নেহাত ছোট নয় — বরং তারা জানে এই বাজার থেকে অনেক বেশি মুনাফা তাদের পক্ষে তুলে নেওয়া সম্ভব।

ফলে, এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একযোগে ফুলেফেঁপে উঠছে বিশ্বায়নের নীতি যাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরি, সেই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পুঁজির মালিকরা, তাদের হাত ধরে দেশীয় বড় বড় পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-গ্রামাঞ্চলের জোতদার-মহাজন-ধনী চাষীর দল — আর, এদের সবার স্বার্থ রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে রঙ-বেরঙের ভোটবাজ রাজনীতি করনেওয়ালা পার্টির নেতারা — শুধু মরতে মরছি আমরা শ্রমিক-কৃষক-গরিব মানুষেরা।

আপনি বলবেন, সবই তো বুঝলাম মশাই, কিন্তু করার কী আছে বলুন তো! দেখুন — "এই সব পার্টিগুলোর কোনওটাই আমাদের না"— একথা আপনাকে আজ আর নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজে থেকেই হাড়ে হাড়ে এই সত্য আজ আপনারা উপলব্ধি করছেন। **কিন্তু, শুধু কি এটুকু বুঝে "আর কিছু করার নেই" ভেবে হতাশ হয়ে মাথা নিচু করে মূল্যবৃদ্ধির চাপকে মেনে নেবেন ? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মুখে রক্ত তুলে খেটে কোনওভাবে এই হামলাকে আরও একবার সামাল দেবার চেষ্টা করবেন ? নাকি, ফুঁসে উঠবেন, রুখে দাঁড়াবেন ?**

এটা ঠিক, আজ যদি দেশজোড়া গরিব মানুষদের একটা সত্যিকারের পার্টি থাকত, যে পার্টি সত্যি সত্যিই আমাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবে, যে পার্টি আমাদের কথায় চলবে, যে পার্টিতে নেতারা আমাদের মাথায় বসে থাকবে না, বরং আমরা, তলাকার শ্রমিক-কৃষকরাই, নিয়ন্ত্রণ করব নেতাদের — এরকম একটা পার্টি থাকলে তো মূল্যবৃদ্ধির হামলার সামনে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই গড়ে তোলা যেত। এবং তাহলে তো আলাদা করে শুধু মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ নয়, গোটা বড়লোকী ব্যবস্থাটাকেই ভেঙে সত্যিকারের শ্রমিক-কৃষকের রাজ কায়েম করার দিকেই এগোনোর স্বপ্ন নতুন করে দেখা যেত। **কিন্তু, আপাতত যখন এরকম একটা পার্টি নেই, বা কালকেই তা গড়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনাও চোখে দেখা যাচ্ছে না, তখন মূল্যবৃদ্ধির হামলার বিরুদ্ধে কিছুই কি করার নেই ? কে বলেছে ?** কোনও সত্যিকারের গরিব মানুষের পার্টির মদত ছাড়াই, শুধু নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরেই কি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-পসকো-কলিঙ্গনগরের কৃষকরা শিল্পায়নের নামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে চলেছেন না ? মাত্র কদিন আগে রেশনব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর সময় সামনে কোনও পার্টি নেই একথা কি গরিব মানুষরা ভেবেছিলেন ? আজকে জুটের শ্রমিকরা-সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিকরা-জি আর এস ই-হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং-হোন্ডার শ্রমিকরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে চেষ্টা কি করছেন না মালিকী হামলাকে মোকাবিলা করার ? তাহলে, কী করা যায় এবং কীভাবে, তা আমরা সবাই মিলে যদি খুঁজে বের করার জন্য উদ্যোগ নিই, তাহলে মূল্যবৃদ্ধির হামলার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধের একটা কোনও রাস্তা কি খুঁজে বের করা যায় না ? আসুন না, আমরা নিজেরাই এই নতুন রাস্তা খোঁজার কাজে হাত ও মাথা লাগাই! তার মধ্যে দিয়েই আগামীদিনের পার্টিটাও কীভাবে গড়ে উঠবে, তারও হয়তো একটা কোনও রাস্তা আমরা খুঁজে বের করতে পারব।

সবশেষে আর একটা কথা। এটা আমরা সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের আগুয়ান শ্রমিকভাইদের কাছে বিশেষভাবে তুলতে চাই। এটা ঠিক, মালিকশ্রেণীর সর্বাত্মক হামলার মুখে পড়ে আপনাদেরকেও বহু পুরোনো অধিকার হাতছাড়া করতে হচ্ছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এখনও আপনারা ঠিকা-ক্যাজুয়াল শ্রমিক-গ্রামের খেতমজুর বা দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষদের তুলনায় কিছুটা হলেও সুবিধেজনক জায়গায় আছেন। আপনাদের অনেকেই এখনও DA-Increment-র সুবিধেটুবিধে কিছুটা হলেও পাচ্ছেন। তাই দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির চাপ কিছুটা হলেও আপনারা সামাল দিতে পারছেন। অথচ, ভাবুন তো, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-ক্ষেতমজুর-দিনমজুরদের কথা। তাদের কিন্তু, সেই সুযোগটুকুও নেই। ফলে, স্বাভাবিকভাবে তাদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরও অনেক বেশি। তার ওপর আপনারা ওদের তুলনায় এখনও অনেক বেশি সংগঠিত — যতই সি পি এম মার্কা পার্টিগুলো আপনাদের সংগঠিত শক্তিকে মালিকশ্রেণীর কাছে বিকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকুক না কেন ও আপনাদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের দাবিদাওয়ার গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করে থাকুক না কেন। কাজে কাজেই, সমাজের

সমস্ত শোষিত-নিপীড়িত-গরিব মানুষদের ঘাড়ে আজকে মূল্যবৃদ্ধি সহ আরও যে হাজার রকমের শোষণ-জুলুমের বোঝা চেপে চলেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে তারা যাতে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সে ব্যাপারে সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে আপনারা কি আপনাদের সচেতনতা ও সংগ্রাম-সংগঠনের অভিজ্ঞতার জোরে তাদের নেতা হিসেবে তাদের সামনে দাঁড়ানোর কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেন না ? ইতিহাস কি আপনাদের কাছে আপনাদের এই সচেতন ভূমিকাই আজকে সবচেয়ে বেশি করে দাবি করছে না ? ■

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিঋণ মকুবের ঘোষণা

গরিব মেহনতী চাষীদের বাঁচাতে পারবে ?

কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ -বাম জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী পি.চিদাম্বরম গত বাজেট বক্তৃতায় ৬০,০০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুবের কথা নভেম্বরে ঘোষণা করেছেন। সরকারি ঘোষণা অনুসারে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষকদের সরকারি ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণ মকুব করে দেওয়া হল। এটাকে কংগ্রেস ও তাদের ইউ.পি.এ. জোট আগামী লোকসভা নির্বাচনে একটা প্রচারের হাতিয়ার করার চেষ্টা করবে। যারা গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব ভালো করে ওয়াকিবহাল নন, তাঁরাও ভাববেন যে কংগ্রেস সরকার চাষীদের জন্য কি না কি বিরাট কাজ করল, ৬০০০০ কোটি টাকা তো চাট্টিখানি কথা নয় — ভাবলেই মাথা গুলিয়ে যায়! কিন্তু অগ্রণী শ্রমিকদের একটু গভীরে গিয়ে বিষয়টাকে বুঝতে হবে, মেহনতী চাষীদের কাছেও ঐ চমকপ্রদ ঘোষণার ভেতরের রহস্যটা খুলে দেখাতে হবে।

১) কিছু হিসাবপত্র নিয়ে ধন্দ!

“জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা” বা এন.এস.এস.ও. দেশের একটা নামকরা ও নির্ভরযোগ্য সংস্থা ছিল। ১৯৯৯তে বি.জে.পি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. জোট সরকারের আমলে ঐ এন.এস.এস.ও. সংস্থা একটা অদ্ভুত কাজ করে — তারা স্রেফ হিসাবের পদ্ধতিটা বদলে দিয়ে দেখায় যে দেশে এবং বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেমন পশ্চিমবঙ্গে জনগণের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা রাতারাতি কমে গেছে। তাদের এহেন বক্তব্যের জন্য তারা এন.ডি.এ. এবং বামেদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল – আগে অপ্রিয় সত্য কথা তুলে ধরার জন্য এন.এস.এস.ও. -র কিছুটা নামডাক ছিল। আমাদের দেশে অর্থনীতিতে যারা পণ্ডিত, তাদের অনেকে তখন থেকে এন.এস.এস.ও.-র তথ্যকে কিছুটা সন্দেহের চোখে হয়তো দেখেন। যাই হোক, সেই এন.এস.এস.ও. ২০০৫এ কিছু তথ্য প্রকাশ করে কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা নিয়ে। কারণ তার আগে “কৃষক” বিষয়টা আবার প্রচারমাধ্যমগুলোতে সামনে চলে এসেছে। এসেছে কোনও বড় আন্দোলনের জন্য নয় — বরং হাজারে হাজারে আত্মহত্যার করার মধ্য দিয়ে। এন.এস.এস.ও. হিসাব করে বলে যে দেশে অন্তত ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত – গড়ে এক-একজনের ধার ১২,৫৮৫ কোটি টাকা। অতএব মোট ধার দাঁড়ায় ৫৪,৫০০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ঐ হিসাবের সময় থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ধারের মোট পরিমাণ আরও বেড়েছে। আবার যেহেতু ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিকদেরই ঋণ মকুব হবে কারণ এদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ ঋণগ্রস্ত – ফলে সবটার দায় সরকারের উপর পড়বে না। কিন্তু এন.এস.এস.ও.-ই আবার বলছে **যে কৃষকদের ঋণের অর্ধেকের বেশি, শতকরা ৫৫ ভাগ না কি সরকারি ও সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার দেওয়া!** তাহলে ঐ ৬০,০০০ কোটি টাকার হিসাবটা আসছে কী করে ? কারণ সরকার তো মহাজন-মালিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ মকুব করছে না! তাহলে কি শুধু ২ হেক্টর পর্যন্ত জমি-মালিকদের মোট ঋণ ১ লক্ষ কোটি টাকাও পেরিয়ে গেছে – যার ৫৫ শতাংশ সরকরি সূত্র থেকে পাওয়া ? অর্থাৎ প্রায় ঐ ৬০,০০০ কোটি টাকা!! নাকি অর্ধেকের বেশি ঋণ সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া – এটা নিছকই গালগল্প ?! নাকি সরকার ঘোষণা করল ৬০,০০০ কোটি টাকা মকুব –অথচ কার্যত তার থেকে অনেক কমই মকুব করতে হবে ? ? এটা নানা অঙ্ক নিয়ে ও সংখ্যা নিয়ে ভেলকি দেখানো হচ্ছে না তো ?

২) পূর্বাঞ্চলের (ও পশ্চিমবঙ্গের) অবস্থা

"জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা"-র হিসাবে আবার ফেরা যাক। তাদের হিসাবে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। তার প্রায় অর্ধেক, প্রায় ৪৬%, মাত্র ৪টি রাজ্যের কৃষক। প্রথম স্থানে উত্তরপ্রদেশ – যেখানে ৬৯ লক্ষ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ – যেখানে ৪৯ লক্ষ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। তারপরের দুটো নাম মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ!! মহারাষ্ট্রে ৩৪ লক্ষ পরিবার ও পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ লক্ষ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত!! মোট "কৃষক পরিবার" গুলির মধ্যে শতকরা কতজন ঋণগ্রস্ত ? অন্ধ্রের কৃষক ঘরগুলির মধ্যে ৮২% অর্থাৎ প্রায় তেরো আনা ভাগ ঋণগ্রস্ত। এটাই এই হিসাবে সারা ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি। মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে অর্ধেকের বেশি কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত। উত্তরপ্রদেশে অবশ্য মোট কৃষক ঘরগুলির মধ্যে ৪০% এর কিছু বেশি ঋণগ্রস্ত।

শুধু তাই নয় — তিনটি রাজ্যে অথাৎ উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ও পশ্চিমবঙ্গে একটা কৃষক ঘরের গড়পরতা কৃষি থেকে আয় বছরে ১০০০ টাকারও কম!! তুলনায় বিহারের কৃষকদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক কম ও কৃষি থেকে গড় আয় পশ্চিমবঙ্গের হিসাবের থেকে বহুগুণ বেশি। এই এন.এস.এস.ও.-র তথ্য ব্যবহার করে সিপিএমরা বড়াই করে তো যে তাদের সুশাসনে এখানে গরিবি কত কমে গেছে! এখন সেই এন.এস.এস.ও.-র তথ্য নিয়ে কী বলবে ? অর্ধেকের বেশি কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত! গড়ে বছরে কৃষি আয় ১০০০ টাকার অনেক কম! মোট ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যার বিচারে সারা ভারতে চতুর্থ স্থান! ভারতের গড়পরতা হিসাব থেকে পশ্চিমবঙ্গে খারাপ চিত্র! এসব দিক থেকে বিচারের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গের খারাপ অবস্থা!! এর নাম বামফ্রন্ট্রে ৩০ বছরের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিতে একনম্বর ?! ধোঁকাবাজির একটা সীমা থাকা দরকার।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অসমে মোট কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ১৮% মতো, অর্থাৎ তিন ভাগেরও কম, ঋণগ্রস্ত। তাদের গড় ঋণের পরিমাণ পরিবার পিছু ১০০০ টাকারও কম। এবং কৃষি থেকে কৃষক পরিবারের গড় আয়ের হিসাবে অসম না কি সারা ভারতের মধ্যে দুনম্বর স্থানে, প্রথম স্থানে জম্মু-কাশ্মীর ও তৃতীয় স্থানে নাকি পঞ্জাব!! এসব হিসাবও কি বাস্তবতাকে তুলে ধরে!

৩) কিন্তু ঐ ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক "কৃষক পরিবার" কারা ? কারা ঋণ মকুবের সুযোগ পাবে ?

সরকার বলছে যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ঐ ঋণ মকুবের সুযোগ পাবে। বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমও তাই বলছে। এমনকি আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ইংরেজি একটা দৈনিক দুঃখ করে লিখেছিল যে কেন আরেকটু বেশি জমি আছে তাদেরও ঋণ মকুব হল না! সরকারি ভাষায় প্রান্তিক কৃষক মানে ১ হেক্টর বা তার কম জমির মালিক। ক্ষুদ্র কৃষক মানে ২ হেক্টর থেকে ১ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক। এভাবে দেখাটা কি ঠিক ?

আমরা জানি ১ হেক্টর মানে প্রায় আড়াই একর যা পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের হিসাবে সাড়ে সাত বিঘে, উত্তরপ্রদেশের বিঘের হিসাবে চার বিঘে। তার মানে, ২ হেক্টর হল পশ্চিমবঙ্গ, অসম-এর হিসাবে ১৫ বিঘে ও উত্তরপ্রদেশের হিসাবে ৮ বিঘে। **সরকার এর সাথে আর কিছুই দেখল না।** সেচ সেবিত ও বছরে তিনবার চাষ হয় এমন ১ হেক্টর শুকনো অঞ্চলের ২ হেক্টরের চেয়েওঅনেক বেশি লাভজনক। সরকার ঐ দরকারি ফারাক করল না। সরকারি অর্থনীতিবিদ-হিসাববিদরাও ঐ হিসাব দেখলেন না। এমনকি "কৃষক ঘর" বলতে যাকে বলা হচ্ছে তার শুধুই জমির মালিকানাটাই দেখা হল, তার শ্রেণীচরিত্র দেখা হল না! অদ্ভুত ব্যাপার!! বরং "শ্রেণী" ব্যাপারটাকেই গুলিয়ে দেওয়া হল।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য চারটে আলাদা আলাদা রকমের "কৃষক" এর বিবরণ দেখি।

(প্রথম) ধরুন ঝাড়খন্ডের শুকনো অঞ্চলে কারোর ২ হেক্টর জমি আছে। বা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার শুকনো অঞ্চলে। সেখানে কোনও সেচের বন্দোবস্ত নেই। আকাশের জলই ভরসা। কোনওরকমে একবার চাষ হয়। খরা হলে বা পোকা লাগলে সেটাও হয় না। এখানে জমির মালিক নিজেই সপরিবারে জমিতে খাটে। কাজের জন্য কোনও মজুর লাগানোর কথা তার কাছে বিলাসিতা। পরিবারের লোকজন বরং চাষের সময় ছাড়া বাকি

সময়ে বাইরে কাজ খোঁজে — খোঁজ পেলে সে কাজও করে। এভাবে তাদের কোনওরকমে চলে। এই ধরনের একটা পরিবারের শ্রেণীচরিত্রের বিচারে "গরিব চাষী" — এমনই চাষী যে নিজেকে বাইরে "লেবার" হিসাবে না খাটালে বাঁচতে পারে না।

(দ্বিতীয়) এবার ধরা যাক কোনও সেচসেবিত অঞ্চলের চাষী, যার ১৫ বিঘা জমিতে বছরে দুবার ধান চাষ হয়। এরকম "কৃষক" মোটামুটি স্বচ্ছল, যদিও কোনও কোনও বছর চাষের নানা অনিশ্চয়তার কারণে এদেরও ভরাডুবি হতেই পারে। তবু এই রকম পরিবার যদি চাষের প্রধান কাজগুলো, যেমন লাঙল দেওয়া/মই দেওয়া, রোয়া, কাটা, ঝাড়া ইত্যাদি নিজের পরিবারের শ্রমেই প্রধানত চালায় — তবে এদেরকে "মাঝারি চাষী" বলা যেতে পারে — এমনই "কৃষক" যে মোটামুটি নিজেরটা নিজে চালায়। (তৃতীয়) কিন্তু যদি কোনও ১৫ বিঘা বা ২ হেক্টর জমির মালিক চাষের প্রধান কাজগুলোতে অংশ না নেয়, স্রেফ ম্যানেজারি করে, গায়ে গতরে খাটার সব কাজ করে মজুরেরা — তবে তাকে আদৌ "কৃষক" বলা যায় না — সে একজন অকৃষক জমি-মালিক ও পুঁজিবাদী কৃষি উদ্যোগপতি বা পুঁজিবাদী জমিদার। (চতুর্থ) যদি কোনও জমির মালিক নিজে জমিতে প্রধান সব কৃষিকর্মে অংশ নেয় এবং বেশ কিছু পরিমাণে মজুরও নিয়োগ করে, তবে তাকে ধনী চাষী বলা হয়। ধনী চাষীটা একটা নামকরণ — হতেই পারে এরকম কারও কারও আয় বড় কারখানার স্থায়ী শ্রমিকের থেকে কমও।

সরকারি ব্যাংক ব সমবায় ব্যাংক কাদের কৃষি ঋণ দেয় ? সাধারণভাবে ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষীরা সরকারি কৃষিঋণ পায় না। এমনকি মাঝারি চাষীদেরও সরকারি ঋণ পেতে গেলে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। এটা আপনারা গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নিলেই বুঝতে পারবেন। কারণ ব্যাংকগুলো এমনি এমনি ঋণ দেয় না — তারা দেখে নেয় যে ঋণের "খদ্দের" আদৌ ভবিষ্যতে সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কি না। এজন্যই সাধারণত ধনী চাষী ও পুঁজিবাদী মালিকরা সরকারি কৃষিঋণ পায়। ফলে ঋণ মকুবের যেটুকু সুযোগ পাওয়া যাবে, এই শ্রেণী দুটির লোকেরাই প্রধানত তা হাতিয়ে নেবে। এবং গত ১০-১৫বছর ধরে এদের ঋণের মাত্রা যা বাড়ছিল ও কৃষিক্ষেত্রে সংকটজনক অবস্থা যেভাবে চলছে — তাতে করে সরকারি অর্থনীতিবিদেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে কৃষিঋণের অনেকটাই ফেরত পাওয়া যাবে না। এটা তো গেল ধনী চাষী ও অকৃষকদের কথা, কিন্তু তাহলে গরিবরা যাবে কোথায় ?

৪) গ্রামের গরিবদের জন্য অন্যরকম ঋণফাঁদ

চিদাম্বরমের এই ঋণমকুবের ঘোষণার পর বিজেপির এক নেতা বলে বসলেন — চিদাম্বরম কেন মহাজনি ঋণমকুবের কথা বললেন না! হয়তো সেই নেতার খেয়ালে ছিল না যে বিজেপি টানা ছয় বছরের বেশি কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল — সে সময়ে মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং/অথবা মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে একটাও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বহু রাজ্যে বিজেপির সরকার আজও আছে। সেখানেও মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে কিছুই করা হয়নি। কারণ মহাজনি প্রথার সাথে চালু শাসনব্যবস্থার যোগাযোগ ডালে ডালে পাতায় পাতায়। যাই হোক এই নেতার কথা শুনে কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার বলে দিলেন যে কৃষকদের মহাজনি ঋণ শোধ করতে হবে না। কৃষকেরা জানে এটা মূর্খের মতো কথা। আজ না শুধলে ভবিষ্যতে তারা অসময়ে ঋণ পাবে কোথা থেকে ?

মহাজনি ঋণ ছাড়া গ্রামের গরিব-মেহনতীর গত্যন্তর নেই। তবে, নিঃস্ব, জমিহীন ক্ষেতমজুরদের মহাজনি ঋণও মেলে না। তাদের ধার করতে হয় সেই আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে, নয়তো কোনও মালিক বাবুর কাছ থেকে। আর সেটা শোধ দিতে হয় বিনা পয়সায় খেটে বা অন্য কোনও বাজে চুক্তির ভিত্তিতে সেই মালিকের জমিতে চাষের সময় খেটে দিয়ে।

৫) এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া কী করে সম্ভব!

গ্রামের গরিবদের হাতে প্রত্যক্ষভাবে, সোজাসুজিভাবে, শাসনব্যবস্থা না এলে, দেশের সব কিছুর ওপর গ্রামের গরিব-মেহনতীদের, শ্রমিক-কৃষকের নিয়ন্ত্রণ চালু না হলে — এই ব্যবস্থা বদলাবে না। যখন গোটা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক-কৃষকের হাতে থাকবে তখনই সবকিছু, এমনকি ব্যাংক সহ "ক্রেডিট"ব্যবস্থা, অর্থ

ব্যবস্থা, বাজার ইত্যাদি সব কিছুই শ্রমিক-কৃষকের হাতে থাকবে – তখনই এই ঋণের ফাঁদ থেকে প্রকৃত চাষীরা মুক্তি পেতে পারে। ■

“নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য গ্রামের গরিবদের উদ্যোগ জারি থাকুক পঞ্চায়েত নির্বাচনেও”

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে উপরোক্ত শিরোনামে কৃষক কমিটি নামে একটি বিপ্লবী কৃষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেট আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। পশ্চিমবাংলায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে, সে ব্যাপারে তাদের এই বক্তব্যের সাথে “শ্রমিক ইস্তাহার“ সম্পাদকমন্ডলী সহমত পোষণ করছে। আর তাই আগুয়ান সংগ্রামী শ্রমিকদের কাছে তাদের এই বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য এই লিফলেটটিকে অবিকৃত অবস্থায় “শ্রমিক ইস্তাহার“-এ আমরা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

— সম্পাদকমন্ডলী, “শ্রমিক ইস্তাহার“

গ্রামের গরীব ভাইবোনেরা,

আবার আরও একটা পঞ্চায়েত ভোট এসে গেল। নাই-নাই করে প্রায় ৩০ বছর ধরে আপনারা এই পঞ্চায়েতকে নিয়ে নাড়াঘাটা করলেন। কী দেখলেন ? কী বুঝলেন ? আবার ভোট দেওয়ার আগে একবার ৩০ বছরের হিসেবনিকেশ করে নিন।

সেই ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েতের ভোটের সময় সি পি এম বলেছিল গ্রামে গ্রামে রাইটার্স তৈরি হচ্ছে। গরিবদের ক্ষমতা তৈরি হবে, কংগ্রেস বলেছিল রামরাজত্ব তৈরি হবে। সে সময় আপনারা অনেকেই ওদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। ভেবেছিলেন তাই হয়তো হবে। সেই সময়কার কংগ্রেসী গুন্ডা আর জোতদার ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পঞ্চায়েতকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। আজ এসে কী মনে হচ্ছে ? সত্যি কি পঞ্চায়েত গরিবদের ক্ষমতা ? গরিবদের মূল মূল সমস্যা — জমি, কাজ, মজুরি, দরিদ্রতা, চিকিৎসা, বাসস্থান, গ্রামে টিকে থাকা ছোটলোক ভদ্রলোকে ভাগাভাগি, কোনওটাই কি মিটেছে ? আপনারাই বলুন। এমনকি আপনারাই দেখলেন যখন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে সরকার জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে নিতে গেল, তখন পঞ্চায়েত কিছু করতে পেরেছে ? পারেনি। এরপর বলুন গরিবদের ক্ষমতা হলে তো পঞ্চায়েত এগুলো করত। তাই না ? আসলে পঞ্চায়েতের হাতে এসব ক্ষমতাই নেই। তাহলে বলুন সে সময় সি পি এম ও কংগ্রেসীরা আপনাদের কত বড় ধাপ্পা দিয়েছিল।

গত তিরিশ বছরে সি পি এম কতবার যে নানা টোপ দিয়ে গরিবদের কাছে হাজির হয়েছে। একবার বলল আই আর ডি পি লোন নিয়ে গরিবরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে। হয়েছে ? একজনও কি দাঁড়াতে পেরেছে ? গ্রামের বেকারদের কাজ দেবে পঞ্চায়েত — কখনও খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, কখনও জওহর রোজগার যোজনা, আজ আবার ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্প। বলুন তো কতদিন কাজ পেয়েছেন ? কদিনের পেটের ভাত হয়েছে ? এই তো ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার কথা — কোথাও হয়েছে ১৪ দিন, কোথাও ২৪ দিন। একবার গ্রামে হিড়িক পড়ে গেল স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়, মহিলা ও পুরুষরা নাকি বিকল্প আয়ের সন্ধান পাবে। সরকার লোন দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে। কত বড় বড় প্রচার। মহিলারা দলে দলে ছুটলেন। গড়েও উঠল গোষ্ঠী। কিন্তু, যে কে সেই, সরকারি হিসেবেই বারো আনা ভাগ গোষ্ঠী প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডিই ডিঙোতে পারল না। বারবার ওদের কথা শুনে ছুটেছেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু বারবারই আপনারা প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং আজ এসে এটা বলা যায় “পঞ্চায়েতের“ ভরসায় আর পার্টিবাবুদের ভরসায় থাকা যায় না। যেটা হয় তা হল অভাবের মধ্যে গলা ডুবিয়ে নেতাদের পায়ে ধরে দু-একটা রিলিফ-অনুদান নিয়ে পঙ্গুর মতো বেঁচে থাকা **সম্মান, আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার মতো বাঁচার পথ যে এটা নয় — সেটা হয়তো আজ অনেকের কাছেই পরিষ্কার।**

আজ পঞ্চায়েত শুধু কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের গোমস্তাগিরি করছে, তাই শুধু নয়। দেশের সমস্ত বড়লোকদের স্বার্থেই কাজ করছে পঞ্চায়েত। পুঁজিপতিদের স্বার্থের শিল্পায়ন — সেই শিল্পায়নের জন্য জমি পর্যন্ত পুঁজিপতিদের জোগাড় করে দেওয়ার কাজও করছে পঞ্চায়েত। শুধু কি তাই ? এখন আবার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য নানা কর্মকাণ্ড চলছে পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে। তাই আজ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরাও পঞ্চায়েতের সাফল্য নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটাচ্ছে।

তবে গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা একটা তৈরি হয়েছে বটে, সেটা হল পার্টির ক্ষমতা — বিশেষ করে সি পি এম পার্টির ক্ষমতা। গ্রামের বড়লোকশ্রেণী-পার্টি-পঞ্চায়েত-পুলিশ সব মিলিয়ে একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, যেটা আজ জনগণেরই ঘাড়ে চেপে জনগণকেই শাসন করছে। **পার্টির এই একচ্ছত্র ক্ষমতা গড়ে উঠেছে আপনাদেরই জন্য**।

সেই প্রথম পঞ্চায়েতের সময় থেকেই আপনারা গ্রামের গরিবরা নিজেদের সমস্ত কিছু ভালোমন্দ, আপনাদের ভবিষ্যত পার্টির কাছে বন্ধক রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন আমাদের পার্টি সি পি এম এত রক্ত ঘাম দিয়ে জন্ম দিয়েছি, সে যখন বলছে আমাদের ভালো করবে, নিশ্চয়ই করবে। এসব ভেবে সেদিন আপনারা গরিবরা আপনাদের সংগ্রাম-সংগঠন-একতাকে বিসর্জন দিয়ে পার্টির ভরসায় বেঁচে থাকা শুরু করলেন। আর এটা আপনারা করলেন স্বেচ্ছায়। এভাবে চলতে চলতে একসময় পেছন ফিরে দেখলেন আপনারা সবাই একা হয়ে গেছেন। এরপর চেষ্টা চলল কীভাবে একা বেঁচে থাকা যায়, অন্যকে পিছনে ফেলে কী করে এগিয়ে যাওয়া যায়। শুরু হল নিজেদের মধ্যে বিভেদ-বিরোধ। লজ্জার কথা হলেও এটাও ঠিক যে আজ সি পি এম পার্টি গ্রামের শাসনকর্তা বনে গেছে। পাড়ার ছোটখাটো বিরোধ থেকে ভাই-ভাইয়ের ঝগড়ার মীমাংসার জন্য আজ পার্টি নেতাদের কাছে ছুটছেন। সামান্য রেশন কার্ড, কিংবা হাসপাতালে দেখানোর জন্য মেম্বারদের একটা সই করার জন্য নেতাদের ঘরে বারবার ধর্ণা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ বাধ্য হচ্ছেন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পার্টির মিছিলে হাঁটতে। পার্টির অবাধ্য হলেই নেতাদের ধমক, মার, এমনকি পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া এসবই অবাধে চলছে। একদিকে পার্টির নেতাদের দিনে দিনে বড়লোক হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে তাদের পেট ভরার পর অবশিষ্ট ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে আপনাদের।

পার্টি এরকম চালাতে পারছে তার কারণ হলেন আপনারাই — আপনাদের প্রশ্রয়েই সব মানিয়ে নিয়ে চলার মানসিকতা, উদ্যোগহীনতা, একা একা বাঁচার চেষ্টাই আপনাদের ক্ষমতাহীন করে তুলছে। আর সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে জড়ো হয়েছে পার্টির হাতে।

তবে আজ যখন কিছুটা হলেও গরিবরা এটা বুঝছেন, তখন সর্বত্র না হলেও বেশ কিছু জায়গায় আপনারা রুখে দাঁড়াচ্ছেন। বেশ কিছু জায়গায় আপনারা যখন নিজেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে রেশন চুরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তখন তো আপনারাই দেখলেন ঐসব ক্ষমতাধর নেতারাই লেজ গুটিয়ে পালাল। কয়েকশো গরিব যখন একজোট হয়ে ঘিরে ধরছে রেশন কার্ড কি জব কার্ডের জন্য তখন বাপ বাপ বলে কাজ হচ্ছে। আপনারাই প্রমাণ করে দিলেন সত্যিকারের ক্ষমতা একমাত্র গরিবেরই হাতে।

পার্টির একছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে আপনাদের বিক্ষোভটা অনেকেই 'সি.পি.এম হঠাও'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে এসে গরিবদের আরও একবার ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

আজ যে সি পি এম পার্টি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সে যে আজ ক্ষমতার আস্ফালন করছে, সেটা করতে পারছে কিন্তু আপনাদেরই এতকালের সব মানিয়ে নিয়ে চলার মানসিকতা, সংগ্রামহীনতা, একতা না থাকার জন্য। কেননা, যেখানেই আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, সেখানেই কিন্তু পার্টির ক্ষমতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তাই আজ যদি আপনি সি পি এম-কে হঠাতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা বি জে পি বা অন্যান্য পার্টির হাত ধরেন, তাহলে একদিন এরাই আবার আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। একদিন কংগ্রেসকে জব্দ করতে সি পি এম-কে ধরেছিলেন, আর আজ সি পি এম-ই আপনাদের জব্দ করে দিচ্ছে। ৩০ বছর ধরে তার খেসারত দিচ্ছেন। আর কত খেসারত দেবেন ?

তাই আজ আপনাদের স্লোগান হওয়া উচিত — সব কিছুকে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতাকে ছুঁড়ে ফেল, সংগ্রাম গড়ে তোল, নিজের সংগঠন নিজে তৈরি কর। সংগঠনের হালটা নিজেদের হাতেই রাখুন। তাহলেই দেখবেন কোনও পার্টি, পঞ্চায়েত, সরকার আপনার ঘাড়ে চাপতে পারবে না। যেই ঘাড়ে চাপার চেষ্টা করবে — খুব সহজেই তাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারবেন। নিজেদের ক্ষমতাকে সংগঠিত করতে পারলেই আপনারা

পারবেন এই গলা, পঙ্গু জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে বাঁচার, মানুষের মতো বাঁচার, সব অধিকার নিয়ে বাঁচার পথে এগোতে।

যারাই জনগণকে নিস্ক্রিয় রেখে পার্টির পেছনে ছোটাতে চাইছে, কিংবা জনগণের লড়াই আন্দোলন বাদ দিয়ে ভোট বয়কট করে কিছু লোক নিজেরাই বিচ্ছিন্নভাবে কিছু খুন খারাপি করে গরিবের উপকার করছি বলে জাহির করছে সেই মাওবাদীদের লাইনেরও বিরোধিতা করতে হবে। কেননা এ পথটা শুধু ভুল নয়, এটা ক্ষতিকরও বটে — এ পথেও সি পি এম-এর মতনই জনগণ নিস্ক্রিয় থাকে।

সুতরাং একদিন জনগণ স্বেচ্ছায় সি পি এম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল — আজ সেই জনগণই স্বেচ্ছায় সি পি এম-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চাইছেন। এই নতুনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উদ্যোগ কিছু কিছু করে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গেছে। আমরা কৃষক কমিটি — আপনাদের এই সংগ্রামের সাথে আছি। আরও ভালোভাবে থাকতে চাই। **যেখানেই আপনারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নিজেরাই পঞ্চায়েতেও লড়াই করতে চান আমরা আপনাদের** সর্বতোভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করব। আর আমরা যেখানে আছি কৃষক কমিটির প্রার্থী দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ –
কৃষক কমিটি

তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিপদ হয় মর, নয়তো মুনাফার রাজকে নিকেশ কর

মজুরি সংকোচন, কাজের নিরাপত্তা ধ্বংস, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ছিটেফোঁটা সামাজিক পরিষেবাটুকুও কেড়ে নেওয়া – মেহনতী মানুষের জীবনের উপর পুঁজিপতি মুনাফাখোরদের এইরকম নানা আক্রমণ আমাদের রোজকার দেখাশোনার মধ্যেই পড়ে। মুনাফা বাড়ানোর তাড়নায় গরিব মানুষের বসতবাটি কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার ধুমও আমরা হালে দেখছি। কিন্তু যদি বলি যে এই মুনাফাখোরদেরই শোষণ-লুণ্ঠন চালানোর অন্ধ তাগিদ আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গোটা পৃথিবীকে, মানবসভ্যতাকে – তা হলে কি বাড়তি বানিয়ে-বলা গোছের মনে হবে ? তাহলে শুনুন।

৫০ বছর পর সুন্দরবন বলে কোনও জায়গা থাকবে না

হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা এমনটাই বলছেন। বেশ কিছু দ্বীপ ডুবে যেতে শুরু করেছে। ক্রমশ বাড়তে থাকা সমুদ্রের জলস্তর আর ৫০ বছরের মধ্যে গিলে নিতে পারে গোটা সুন্দরবনটাকেই। হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কয়েকশো প্রজাতির বন্য জীবজন্তুকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে ঠেলে দেওয়া এই বিপর্যয় কীসের জন্য ? সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাচ্ছে কেন ? কারণটা হল – গোটা পৃথিবীতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা বরফ অনেক দ্রুতহারে গলতে শুরু করেছে, সমুদ্রের জল বেড়ে যাচ্ছে। আর শুধু সুন্দরবনই নয়, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রায় ১৩ কোটি মানুষের বসবাস এমন এলাকায় যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ মিটার বা তার কম। বাড়তে থাকা সমুদ্রের জল তাদের বাসভূমি কেড়ে নিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত করবে ১০০ বছরের মধ্যেই।

গঙ্গা স্রোতহীন হয়ে পড়ে থাকবে বেশির ভাগ সময়

দ্রুতহারে বরফ গলে যাওয়ার জন্য হিমালয়ের হিমবাহগুলো ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিমবাহগুলোর মধ্যে অন্যতম গোমুখ হিমবাহ, যা গঙ্গা নদীর উৎস। এইভাবে চলতে থাকলে ৫০-৬০ বছরের মধ্যে হিমবাহগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উত্তর ভারতের নদীগুলো বছরের বেশির ভাগ সময় স্রোতহীন শুকিয়ে-যাওয়া-অবস্থায় পড়ে থাকবে – কারণ হিমবাহ-গলা জলের উৎস হারিয়ে তারা তখন শুধুমাত্র বৃষ্টির জলের

উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ফলাফলটা একবার ভাবতে পারছেন ? উত্তর ভারতের কৃষি বৃষ্টির উপর যদি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, প্রায় সব জমিতেই বছরে একবারের বেশি চাষ অসম্ভব হয়ে ওঠে, মন্বন্তর ও মড়কের সেই অন্তহীন দিনগুলোর পরিণাম কী হবে ? ভারতবর্ষের প্রায় ৭০ কোটি খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে খেত-খামারি, মাছধরা বা জঙ্গলের সঙ্গে। পরিবেশের এইরকম পরিবর্তন তাদের অধিকাংশেরই জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে দেবে।

সংকট বিশ্বজুড়েই

শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীই এমন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের মুখোমুখি। বিজ্ঞানীদের হিসাবমতো, এখনকার মতোই যদি সবকিছু চলে তাহলে আর ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধি। আর বর্তমানের চেয়ে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেই পৃথিবী বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে; বর্তমান প্রাণীজগতের ১০ ভাগের ৩ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। গরিব মেহনতী মানুষদেরই এই সংকটের বোঝা বইতে হবে সবচেয়ে বেশি।

কেন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা ?

আমাদের, শ্রমিক মেহনতীদের, দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী বড় বড় পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের যে মুনাফা-লালসা, গোটা পৃথিবীর এই অভূতপূর্ব সংকটের জন্যও দায়ী তাই-ই। কীভাবে তা একটু খুলে দেখা যাক। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর মতো বেশ কিছু গ্যাসের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে যাওয়া। এই গ্যাসগুলি তাপকে নিজেদের মধ্যে শুষে নিয়ে ধরে রাখে, তাই এদের পরিমাণ বেড়ে গেলে তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। সুতরাং, এখনই পরিবেশে এদের পরিমাণকে কমাতে না পারলে সংকটের কোনও সমাধান নেই। প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল বিজ্ঞানীরা এইসব কথা বলছেন। অথচ পরিবেশে এই সমস্ত গ্যাসের পরিমাণ কমানো তো যাচ্ছেই না, বরং তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কমাতে গেলে সবচেয়ে আগে যা করতে হবে, তার মধ্যে প্রধান হল: ১) শিল্প উৎপাদনের বর্তমান চালু পদ্ধতির ঢালাও সংস্কার করা যাতে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে উষ্ণতাবর্ধক গ্যাসের বেরোনো কমানো যায়, ২) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ফ্রিজ, এয়ারকুলার, দুই-চাকা/চার-চাকার পেট্রোল/ডিজেল চালিত গাড়ি যতো কমানো যাবে উষ্ণতাবর্ধক গ্যাসের পরিমাণও ততো কমতে থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুতেই মালিক-পুঁজিপতিদের ভয়ানক আপত্তি। গোটা বিশ্ব জুড়ে তারা মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদনের খরচ কমাতে মরীয়া (আমাদের, শ্রমিকদের, ক্রমাগত মজুরি কমানোর হামলার অভিজ্ঞতা তো আমাদের রোজই হচ্ছে)। সেইজন্য, উৎপাদনের খরচ বেড়ে মুনাফা কমে যাবে বলে উৎপাদন পদ্ধতির কোনও সংস্কার করতে তারা রাজী নয়। মুনাফার অন্ধ তাড়না তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যে ৫০-৬০ বছর পর গোটা জীবজগতের কী দুর্গতি ঘটতে চলেছে তা নিয়ে ভাবতে তারা অসমর্থ। অন্যদিকে, ধনীদের ভোগবিলাসে লাগাম পড়ানোরও বিরোধী তারা। তাদের আরও আরও মুনাফা নির্ভর করে আছে এই ভোগ্যপণ্যের বাজারকে আরও বাড়ানোর উপর – তার জন্য লক্ষ কোটি গরিব-মেহনতী উদ্বাস্তু হলে, নিঃস্ব হলেও বা তাদের কী এসে যায় ? আজ যেহেতু এই মুনাফাখোরেরা এবং তাদের মুনাফার উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচা মন্ত্রী-আমলা-সেনাপতিদের হাতেই রয়েছে শাসনক্ষমতা, তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়ে যাওয়া আটকানো যাচ্ছে না। প্রমাণ হিসাবে হালফিলের উদাহরণের কথাই ধরা যাক।

মুনাফার পৌষমাস, পৃথিবীর সর্বনাশ

টাটার ন্যানো গাড়ি নিয়ে বড়লোকদের কত না হইচই! যারা মোটরসাইকেল চালাত, তারা এখন গাড়ি চড়বে (অবশ্য,বহু ব্যবহারে লজ্‌ঝড়ে হয়ে গেছে যাদের সাইকেল, তাদের একটা নতুন সাইকেল কেনার সংস্থান হচ্ছে না)! হাতে গরমাগরম ক্যাশ-এর অভাব থাকলে জমানো বিষয়সম্পত্তি বন্ধকী দিয়ে কার-লোন নাও, গাড়ি ঘরে তোল — ব্যাংকরা সব দোর খুলে ডাকছে। এ লীলাখেলা কত না মুনাফার পাহাড় জমাবে! টাটার মতো বড় শিল্পপতিদের মুনাফা। সুদখোর ব্যাংকদের মুনাফা। ডিজেল-পেট্রোল-এর ব্যবসা থেকে মুনাফা-চোষা দেশ-

বিদেশের বড় বড় পুঁজিপতিদের মুনাফা। কত ঝকঝকে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাই এর প্রচার চলছে। কেন্দ্র-রাজ্য সরকারেরা সব কোমর বেঁধে লেগেছে। কেউ চাষী ঠেঙিয়ে কারখানার জায়গা করে দিচ্ছে, তো কেউ আদিবাসী খুন করে কাঁচামাল আকরিক লোহা লুঠের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।

আর প্রতিটি নতুন গাড়ি মানে দৈনিক গড়ে আরও ১০ লিটার জ্বালানি তেল পোড়া, প্রতি ১ লিটার তেল পোড়া মানে বাতাসে আরও ৩ কেজি উষ্ণতাবর্ধক গ্যাস, অর্থাৎ পৃথিবীর আরও দ্রুত সর্বনাশ।

(আর, এর ফলে অন্যান্য আরও যে সব বিপদ আসবে, তার আলোচনায় আর নাই বা যাওয়া হল!)

সর্বনাশ ঠেকানোর রাস্তাটা কী ?

এভাবেই আজ বিপদগ্রস্ত পৃথিবী। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফা আরও দ্রুত আরও বাড়ানোর তাগিদে চালিত হয়ে আজ বিশ্বজুড়ে উৎপাদন যেভাবে হচ্ছে, তা এভাবে মানবসমাজকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সর্বনাশের দিকে। এককথায় বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এই বিশ্বের এই আবহাওয়ার পরিবর্তন, বা গরম হয়ে ওঠার জন্য দায়ী। এর সমাধান করতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই। কারণ দুনিয়াজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তামাম মেহনতী মানুষই একমাত্র পারে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিকেশ করে শ্রমিকরাজ গড়ে তুলতে। তারাই একমাত্র পারে সমগ্র উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ-বণ্টন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন চালিয়ে – অর্থাৎ, কোনটার বেশি উৎপাদন দরকার, কোনটার কম অথবা, কোনটার উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া দরকার, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সমগ্র সমাজের স্বার্থে চালনা করতে। আর, "মুনাফার জন্য উৎপাদন" – বর্তমানে চালু এই ব্যবস্থাটাই উপড়ে ফেলা গেলে অনেককিছুই করা যায়, করার সামর্থ অর্জন করা যায়। সে কাজে হাত লাগানো দরকার, এখুনি।

মে দিবস, ২০০৮এ —

হে মার্কেটের সংগ্রামের শহীদ বীর অ্যাডল্ফ ফিশারের বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ

[১৮৮৬-র ১লা মে। আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে অন্তত চল্লিশ হাজার শ্রমিক সে দিন জড়ো হয়েছিলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে। দুদিন ধরে চলল তাদের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচী। অবশেষে এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ ভাঙতে ৩রা মে, ম্যাককর্মিক কারখানার ধর্মঘটী আর ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের মধ্যেকার এক সংঘর্ষকে কাজে লাগাল পুলিশ। পুলিশের গুলিতে অন্তত ছ জন শ্রমিক মারা গেলেন, আহত হলেন অন্তত ৫০ জন।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ৪ঠা মে জড়ো হলেন হে মার্কেটে। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ সভা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে ঘটনাস্থলে হাজির হল পুলিশ । তার পরের ঘটনা আজ ইতিহাস। পুলিশেরই এক গুপ্তচরের ছোঁড়া বোমার আঘাতে নিহত হল এক পুলিশ, আহত হল পাঁচজন। পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালাল নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর — পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহত হলেন অজস্র শ্রমিক। শ্রমিক মহল্লাগুলোতে চলল নৃশংস পুলিশী সন্ত্রাস। শ্রমিকদের আট নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করল। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করা হল। বিচারে এদের সাতজনকেই ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হল। ১৮৮৭র ১১ই নভেম্বর ফাঁসির দড়ি গলায় পড়লেন পার্সনস্, স্পাইজ, জর্জ এঙ্গেল আর অ্যাডল্ফ ফিশার।

অভিযুক্ত আটজনের যখন বিচার চলছিল, সেই সময় বিচারসভায় অন্যতম অভিযুক্ত অ্যাডল্ফ ফিশার একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাটির নির্বাচিত কিছু অংশ আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

একটা লম্বা সময় ধরে মার খাওয়া আর আত্মসমর্পণের পালা শেষ করে দেশে দেশে শ্রমিক-কৃষকের নতুন

লড়াই তলা থেকে স্বাধীনভাবে একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আর, সরকার-প্রশাসন আর পুরোনো পার্টিগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই লড়াইগুলোর ওপর। যারা এদের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং লড়াইগুলো যাতে পুরোনো পার্টিগুলোর চিন্তাচেতনা থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের শক্তির ওপরে ভরসা করে দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের ওপরেও নামছে সরকার-প্রশাসন আর পুরোনো পার্টিওয়ালাদের হামলা। সি ই এস সি-র ঠিকা শ্রমিক ও তাদের স্বাধীন ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট রামপ্রবেশ সিং-কে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে সিটুর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। নন্দীগ্রামের কৃষকদের স্বাধীন সংগ্রামের পাশে দাঁড়ানোর অপরাধে "মাওবাদী" ছাপ্পা মেরে নন্দীগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির সংগঠক মিঠু ঘোষকে। শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা দেশ জুড়েই সংগ্রাম ও সংগঠনের অধিকারের ওপর এভাবে হাত পড়তে শুরু করেছে। তলাকার শ্রমিক-কৃষকদের স্বাধীন লড়াই যখন একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে, তখনই রাষ্ট্রও ক্রমশ বেশি বেশি করে স্বৈরতান্ত্রিক চেহারা নিয়ে সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকদের সামনে হাজির হতে শুরু করেছে।

এই রকম একটা সময়ে মে দিবসের লড়াইয়ের বীর শহীদ অ্যাডল্ফ ফিশারের কোর্টরুমে রাখা বক্তৃতাটি আমাদের কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হচ্ছে। সেই কারণেই আমরা প্রকাশ করছি এই বক্তৃতা — সম্পাদকমণ্ডলী, "শ্রমিক ইস্তাহার"*]*

মাননীয় বিচারক মহোদয়, আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, কেন আমাকে মত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না। (...) আমার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কেননা, আমি কোনও অপরাধ করিনি। হত্যার অপরাধে এই আদালতে আমার বিচার হয়েছে, ওদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠিত করার অপরাধে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। (...) কিন্তু, সে যাই হোক, যদি আমাকে রাষ্ট্রবিপ্লববাদী হওয়ার জন্য মরতে হয়, যদি আমাকে মরতে হয় সাম্য-মৈত্রী আর স্বাধীনতার কথা বলার জন্য, তবে আমি প্রতিবাদ করব না। মানবজাতির মুক্তির জন্য আমাদের ভালোবাসার শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তবে আমি প্রকাশ্যেই বলছি জীবনের অধিকার আমি হারিয়েছি। কিন্তু, আমি হত্যাকারী নই। হে মার্কেটের সভা যারা সংগঠিত করেছিল, আমি যদিও তাদের একজন, তবে বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। সম্ভবত, রাষ্ট্রের অ্যাটর্নি গ্রিনেলের এই ঘটনার সাথে যেটুকু যোগাযোগ, তার চাইতে বাড়তি কোনও যোগাযোগ এই ঘটনার সাথে আমারও ছিল না। আমি অস্বীকার করছি না যে হে মার্কেটের সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, (...) কিন্তু না, হে মার্কেটের সভা সন্ত্রাস ছড়াতে বা অপরাধ করতে ডাকা হয়নি। সভাটি ডাকা হয়েছিল **অত্যাচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে। সভায়** মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ম্যাককর্মিক কারখানায় ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে কথা হয় এবং পরদিন **পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে** একটা জনসভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওয়ালার এই মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি নিজেই হে মার্কেটে জনসভা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে হ্যান্ডবিল ছাপানো ও সভার বক্তাদের ব্যবস্থা করার জন্য তৈরি হওয়া কমিটিতে থাকতে বলেন। আমি সেটাই করেছি — আর কিছু নয়।

পরদিন আমি ওয়েবার এবং ক্লিন কোম্পানী থেকে ২৫,০০০ হ্যান্ডবিল ছাপাবার বন্দোবস্ত করলাম এবং হে মার্কেটের সভায় স্পাইজকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। হ্যান্ডবিলে প্রথমে আমি লিখেছিলাম — "শ্রমজীবী মানুষেরা, অস্ত্র হাতে সভায় আসবেন"। এভাবে লেখার পেছনে আমার নিজের একটা ভাবনাও ছিল। **কেননা, আমি চাইনি , আগেও যেভাবে হয়েছে, এবারেও সেভাবে যেন শ্রমজীবী মানুষদের গুলি খেয়ে মরতে না হয়।** কিন্তু কয়েকটা কপি ছাপা হবার পর "আরবাইটার জিট্যুং" দপ্তরে আমাকে দেখাতে আনা হলে কমরেড স্পাইজ তার একটা পড়ে দেখলেন। হ্যান্ডবিলটা আমাকে দেখিয়ে তিনি বললেন — "দেখো ফিশার, এগুলো ওখানে বিলি হলে আমি বলব না।" আমিও তখন মেনে নিলাম (...)। এবং ওই সভার ব্যাপারে ওইটুকু কাজই আমাকে করতে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, হে মার্কেটের সভায় সোয়া আটটা নাগাদ আমি হাজির হয়েছিলাম (...)। ওখানে (...) বসে থাকতে থাকতেই বিস্ফোরণের ঘটনাটা ঘটল। আমার কোনও ধারণাই ছিল না যে এরকম কিছু ঘটতে পারে, (...)।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকমই যে, যা আমি এর আগেও বলেছি, এই বিচারশালায় জুরিরা আমাকে মৃত্যুদণ্ডের যে রায় দিয়েছেন, তা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য নয়, তা রাষ্ট্রবিপ্লববাদের বিরুদ্ধে। আমি এভাবেই দেখছি যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তার কারণ এটা নয় যে আমি একজন হত্যাকারী, বরং কারণ এটাই যে আমি একজন রাষ্ট্রবিপ্লববাদী। আমি কখনও-ই হত্যাকারী ছিলাম-ও না। (...) কিন্তু, আমি এমন একজন মানুষকে জানি যে একজন হত্যাকারী হবার দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই ব্যক্তিটি হলেন সরকারি অ্যাটর্নি গ্রিনেল; কারণ তিনি এমন সব লোকজনকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির করছেন, যারা নিজেরাই ভালোভাবে জানে যে শপথ নিয়ে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং আমার বিরুদ্ধে যদি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়, তবে আমি সকলের সামনে একজন খুনী হিসেবে মিঃ গ্রিনেলকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে ঘেন্না ওগরাব। কিন্তু, শাসকশ্রেণী যদি ভাবে আমাদের কয়েকজনকে ফাঁসি দিয়ে, জনাকয় রাষ্ট্রবিপ্লববাদীকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে তারা রাষ্ট্রবিপ্লববাদকেই খতম করে দিতে পারবে, — তবে তারা ডাহা ভুল করবে। কারণ, একজন রাষ্ট্রবিপ্লববাদী **নিজের জীবনের থেকেও আদর্শকে বেশি ভালোবাসে**।

একজন রাষ্ট্রবিপ্লববাদী তার আদর্শের জন্য সব সময় মরতে প্রস্তুত। (...) আপনারা জানবেন — কোনও আদর্শকে হত্যা করা যায় না, বড়জোর আপনারা সেই আদর্শে বিশ্বাসী কোনও ব্যক্তির জীবন নিতে পারেন। ন্যায়ের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের ওপর যত বেশি বেশি করে অত্যাচার হবে, ততই তাড়াতাড়ি তাদের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। যেমন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — বিচারের আসনে বসে থাকা ১২ জন "সম্মানীয় ব্যক্তি" **এরকম একটা অন্যায় ও নৃশংস রায়** দেওয়ার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লববাদকে এগিয়ে যেতে যতখানি ভূমিকা নিলেন, ততখানি ভূমিকা ফাঁসির নির্দেশ পাওয়া রাষ্ট্রবিপ্লববাদীরা সবাই মিলে একটা গোটা জীবনেও নিতে পারত না। এই মৃত্যুদণ্ড আসলে এদেশের স্বাধীন বক্তব্য, স্বাধীন প্রকাশনা ও স্বাধীন চিন্তার মৃত্যুদন্ড। এবং জনগণও অবশ্যই এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠবেন। আমার যা বলার ছিল, তা এটুকুই।

[হে মার্কেটের ঘটনায় যে আটজন নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আদালতে রাখা তাদের প্রত্যেকেরই বক্তৃতা http://www.chicagohs.org/hadc/books/b01/B01.htm ওয়েবসাইটে ইংরাজি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। ফিশারের বক্তৃতাটি বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় পুরোটাই নির্ভর করেছি "একুশে" প্রকাশিত "ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের গান" বইটির ওপর। – সম্পাদকমণ্ডলী]

তামিলনাড়ুর নতুন শিল্পাঞ্চলে কী হালত শ্রমিকদের ?

[এবারে "শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা, শ্রমিকদের ভাবনা — শ্রমিকরাই লিখছেন" এই কলমে আমরা সরাসরি কোনও শ্রমিকের লেখা প্রকাশ করছি না। তার বদলে এখানে আমরা একজন লড়াকু শ্রমিকের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরছি। তিনি তার অভিজ্ঞতা কথাপ্রসঙ্গে আমাদের এক সাথীর কাছে বলেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের সেই সাথী আমাদের লিখে পাঠান। এবার আমরা সেটাই প্রকাশ করছি।

— সম্পাদকমণ্ডলী, "শ্রমিক ইস্তাহার"]

কথা হচ্ছিল সুধাকরদার সাথে। সুধাকর রাউত, আদতে উড়িষ্যার লোক, কাজ করতেন পশ্চিমবাংলার এক নামজাদা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়। মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে সামনে থেকে লড়তে গিয়ে লক-আউটের শিকার হয়ে এখন গেটের বাইরে। কদিন আগে দেখা হতে বলছিলেন ওখানকার এক বছরের অভিজ্ঞতা।

এখন তিনি কাজ করেন চেন্নাই শহর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে থিরুভল্লুর জেলার গুমিরিপুন্ডি "এক্সপোর্ট প্রোমোশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক"-র এক কারখানায়। নয়া অর্থনৈতিক নীতির পর্বে বছর দশেক আগে গড়ে ওঠে এই

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং তৈরি হয় শ চারেক কারখানা। এর মধ্যে দুশোর ওপর কারখানাই হল ফাউন্ড্রি ও রোলিং মিল। শিল্পমহলে এই কারখানাগুলো নাকি পরিচিত "Scrap ইন্ডাস্ট্রী" নামে। "Scrap ইন্ডাস্ট্রী"র কোম্পানীগুলো দেশ-বিদেশ থেকে মেটাল Scrap /বাবরি কিনে আনে। তারপর নিজেদের ফাউন্ড্রীতে সেগুলো গলিয়ে তার থেকে রোলিং মিলে নানান মেটাল রড-পাইপ-সিট ইত্যাদি তৈরি করে। যেহেতু কারখানাগুলোতে র মেটেরিয়াল হিসেবে মূলত Scrap/বাবরি ব্যবহার হয়, তাই এগুলো "Scrap ইন্ডাস্ট্রী" নামে পরিচিত।

সুধাকরদা কাজ করেন এরকমই একটা Scrap কারখানায়। কাগজে কলমে মালিকের তিনটে কারখানা, আসলে কারখানা একটাই! সবটাই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার নানান কারসাজি। সব মিলিয়ে ২৫০এর মতো শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিকদের প্রায় পুরোটাই বিহার-উত্তরপ্রদেশ আর উড়িষ্যা থেকে আসা। (সুধাকরদা বলছিলেন — গুমিরিপুন্ডির Scrap ইন্ডাস্ট্রীর প্রায় পুরো শ্রমিকই না কি এই তিন রাজ্য থেকে যাওয়া।)

মালিক প্রধানত সিঙ্গাপুর থেকে Scrap কিনে আনে। দাম পড়ে কিলো প্রতি ৩ টাকা ৮০ পয়সা।এই Scrap চলে আসে ফাউন্ড্রীর ফার্নেসে। ফার্নেসের তাপমাত্রা ১২০০ থেকে ১৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই শ্রমিকদের বেলচা করে ফার্নেসে Scrap দিতে হয়। Scrap গলতে শুরু হলে বিষাক্ত ধোঁয়ায় ফাউন্ড্রী ভরে যায়, তার মধ্যেই ওই গরমে গলন্ত Scrap-র ওপরে ভেসে ওঠা ফেনা বড় হাতায় করে তুলে বাইরে জমা করতে হয়। গলন্ত Scrap এসে জমা হয় পাইপের মতো একটা ছাঁচের (মোল্ড) মধ্যে। ছাঁচের মধ্যে গলিত Scrap দ্রুত জমাট বাঁধতে শুরু করে।এই অবস্থাতেই, পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে, তখনও ছাঁচটা গলিত Scrap-র তাপে রীতিমতো গরম, শুইয়ে রাখা ওই পাইপের মতো ছাঁচটির ওপর দাঁড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জমাট বাঁধা Scrap-কে বের করতে হয়। এরপরে কাজ শুরু রোলিং মিলে।

এই যখন কাজের অবস্থা, তখন শ্রমিকরা কী পায় ? পুরো কারখানাটাই চলে কন্ট্রাক্ট শ্রমিকে (গোটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কেই স্থায়ী শ্রমিক বলে কোনও ব্যাপার নেই, যদিও পার্কে সব মিলিয়ে কাজ করেন অন্তত পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক)। শ্রমিকদের থোক মাস মাইনে শুরু হয় ২৭০০ টাকা থেকে, সর্বাধিক মাস মাইনে ৫,০০০ টাকা। ই এস আই-পি এফ জাতীয় কোনও সুযোগসুবিধা নেই। মাইনে দেবার সময়ের কোনমা-বাপ নেই। শ্রমিকরা যে ঐ কারখানায় কাজ করেন, তার কোনও প্রমাণ তাদের দেওয়া হয় না। সাদা হাজিরা খাতায় শ্রমিকদের সই করতে হয়। বছরে একটাও ছুটি নেই। কাজের সময় দিনে বারো ঘণ্টা — সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। এর পরেও দরকারমতো সিঙ্গল রোজে ওভারটাইম। তার মানে ওরকম গরমে টানা ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি। থাকার জায়গা কারখানার মধ্যেই গড়ে তোলা ১০০ স্কোয়ার ফুটের এক-একটা খুপড়ি — এক খুপড়িতে তিন-চারজন শ্রমিককে গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হয়। ওই গরমে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের দেওয়া হয় সাকুল্যে একটা করে হেলমেট আর একজোড়া হ্যান্ড গ্লাভস। গুমিরিপুন্ডির সব Scrap কারখানাতেই অবস্থা এ রকমটাই।

সুধাকরদা বলছিলেন, স্ক্র্যাপের মধ্যে অনেক সময়েই ছোট গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিপজ্জনক আরও নানা জিনিস থেকে যায়, যেগুলো গলার আগেই ফাটতে শুরু করে এবং ওরকম গরম গলিত Scrap চারদিকে ছিটকাতে থাকে। এবং এগুলো লেগে প্রায়শই শ্রমিকরা মারা যান বা আহত হন। দুর্ঘটনা ছোটখাটো হলে মালিকরা তাও শ্রমিকটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব খালাশ করে। আর যদি কেউ মরে যান, তাহলে মালিকরা স্রেফ তার বডি নিয়ে কারখানার বাইরে পাঁচ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর ফেলে দিয়ে আসে। সুধাকরদা তাদের কারখানাতেই মাত্র দু মাস আগে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনার কথা বলছিলেন। সেদিন পাইপের মতো ছাঁচটি খাড়া করে দাঁড়ানো অবস্থাতে ছিল। এক-একটা ছাঁচের ওজন এক টনের মতো। হঠাৎ কী করে ছাঁচটি কাত হয়ে পড়ে যায়। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজন শ্রমিক। তার পায়ে পড়ে তার বাঁ পায়ের পাতার সামনের দিকটি দুটো আলাদা টুকরো হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে রাতের শিফটে। সুধাকরদার ভাষায়, তাদের ম্যানেজমেন্ট অন্যদের তুলনায় একটু বেশি দয়ালু। তাই তারা শ্রমিকটিকে সিকিউরিটির হাত দিয়ে হাসপাতালে পাঠায়, কিন্তু সেই সিকিউরিটি হাসপাতালে রিপোর্ট করে — অচেনা লোক, সিকিউরিটি রাতের বেলা তাদের কারখানার সামনে হাইওয়ের ওপর ওই অবস্থায় লোকটিকে পেয়েছে, দয়া করে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

শুনতে শুনতে সুধাকরদাকে বললাম — এ তো আমাদের আসানসোল-দুর্গাপুর হাইওয়ের ধারে গড়ে ওঠা স্পঞ্জ আয়রনের কারখনাগুলোতেও শুনেছি মালিকরা এরকমটাই করে। সুধাকরদা আমার দিকে করুণার হাসি

হেসে বললেন — শুনুন আমার পরিচিত উড়িষ্যার বেশ কিছু শ্রমিক সুরাটের স্পিনিং মিলগুলোতে কাজ করে, ওখানেও এভাবেই কাজ হয়। আপনারাই আমাদের বলেছেন না — দেশজোড়া মালিকরা এক নীতিতেই চলছে! আর সব সরকাররাই সেই নীতি অনুযায়ীই কাজ করছে!

সব শুনেটুনে সুধাকরদাকে বলছিলাম — সুধাকরদা, আপনি তো একজন লড়াকু শ্রমিক, আপনার কি মনে হয় শ্রমিকরা সব মেনে নিচ্ছে ? ম্লান হেসে লড়াকু সুধাকরদা বললেন — শুনুন, গোটা গুমিরিপুন্ডিতে একটা কোনও কারখানাতেও ইউনিয়ন নেই। সপ্তাহ শেষে পুলিশ-নেতারা আর মস্তানরা এসে মালিকদের কাছ থেকে তাদের "হপ্তা" নিয়ে যায়। মালিকরাও দেয়। কারণ একটাই — কোনওদিন কোনও শ্রমিক যদি বিগড়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে যাতে তার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। একবার ওখানকার এক কারখানায় সি পি এম নেতারা একটা ইউনিয়ন করার চেষ্টা করেছিল। একমাসের মধ্যে কারখানাটা উঠে যায়, এবং অন্য আরেক জেলায় আরেক শিল্পাঞ্চলে নতুন করে ঐ একই কারখানা ঐ মালিক তৈরি করে, আর সি পি এম পার্টির যে লোকটি শ্রমিকদের জড়ো করার চেষ্টা করছিল — কদিন বাদে তার লাশ হাইওয়ের ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারপর বলছিলেন — তাই বলে ভাববেন না, শ্রমিকদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নেই। এই তো আমাদের কারখানাতেই একবার ২২ তারিখ হয়ে গেল, তবু মাইনে দেওয়ার নামগন্ধ নেই। এ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যের পরে কারখানার মধ্যেই কলের ধারে চান করতে করতে আমিই শ্রমিকদের বলছিলাম, কাল যদি মাইনে না দেয়, কাজ করব না। ঘটনাক্রমে পরদিনই মাইনে চলে এল। সবাই মাইনে পেয়ে গেল, শুধু হ্যামারম্যানরা মাইনে পেল না। বাদবাকি কারখানায় কাজ চালু হলেও হ্যামারম্যানরা কাজ করল না, ফলে প্রোডাকশনও হল না। মালিক সে বার বেশি না ঘাঁটিয়ে সে দিনই হ্যামারম্যানদের মাইনে দিয়ে দিল। কাজেই যা চলছে, শ্রমিকরা সবই মেনে নিচ্ছে ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে, এটা সত্যি, শ্রমিকরা ভয়ও পাচ্ছে। সবই অন্য রাজ্য থেকে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক তো। সুধাকরদা শেষ করলেন এই বলে — আমি এটা মানি, যা চলছে ওখানে, তাতে নিশ্চিন্ত থাকুন আজ না হোক কাল ওখানে শ্রমিকরা ফাটবেই। তবে আমার ধারণা, একটা কারখানায় আলাদা করে ওখানে কিছু করা যাবে না। করতে হলে নানান কারখানার শ্রমিকদের একসাথে একজোট হতে হবে। আমি থাকতে থাকতে তা ঘটবে কি না জানি না। তবে আমি থাকতে থাকতে হলে আপনি জেনে রাখুন আমাকে ওখানেও সামনেই দেখতে পাবেন।

সুভাষ রায় কর্তৃক সম্পাদিত, তুষার ভট্টাচার্য, ১৪২/৩ বিশালাক্ষ্মীতলা রোড কলকাতা ৬০ দ্বারা প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস ২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত